গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩১, সংখ্যা ৫ সম্পাদক : শ্যামকৃষ্ণ সাহা ১৩৯৬, ভাদ্র

CALCUTTA UNIVERSITY

সূচী

পৃষ্ঠা

গ্রন্থাগারে মানবসম্পদ বিকাশ (সম্পাদকীয়) ৯২

প্রমীল চন্দ্র বসু

ইতস্ততঃ (স্মৃতিচারণ) ১০৫

নন্দিতা ভট্টাচার্য

কর্মকালীন প্রশিক্ষণ (In house training) সম্পর্কে কিছু কথা ১১১

কলেজ গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মীদের কনভেনশন ১১৪

P. Jana

ENGLISH ABSTRACTS

of the articles etc. of 'GRANTHAGAR' ১২০

প্রচ্ছদ : অমিত পাল

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বর্ষ ৩৯, সংখ্যা ৫ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৬, ভাদ্র

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগারে মানবসম্পদ বিকাশ

গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানব সম্পদ বিকাশের বিষয় আজ আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। এ বছর ইয়াসলিক তাদের বার্ষিক সম্মেলনে এই বিষয়টিকে আলোচনার ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই আলোচনার মূল সুর বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি সম্পর্কে দৃষ্টি দেওয়া যাক। বিশেষ করে এ রাজ্যে যে সমস্ত বিষয় গ্রন্থাগার ক্ষেত্রে মানবসম্পদ বিকাশের দিকগুলিকে প্রভাবিত করছে সেগুলির পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

অবিভক্ত বঙ্গদেশে ১৯৩৩ সালে বাঁশবেড়িয়ায় হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ, সমসাময়িক কালেই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে ডিপ্লোমা শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন; ১৯৩৭ সাল থেকে পরিষদ পরিচালিত নিয়মিতভাবে সার্টিফিকেট কোর্স এর প্রবর্তন, ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা কোর্সের প্রবর্তন এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর কোর্স বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রভৃতি ঘটনা রাজ্যের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মানব সম্পদ বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়। এরাজ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘকাল যাবৎ প্রধান মানবসম্পদ সরবরাহকারী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত কর্মীদের নিয়োগের ক্ষেত্র ছিল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান। ইতিপূর্বে কোন সংস্থাতেই গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়োগে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণ আবশ্যিক যোগ্যতা ছিল না। ক্ষেত্র বিশেষে গ্রন্থাগারে এমন সমস্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হোত যাদের দিয়ে অন্য কোন কাজ করানো চলত না। ফলে গ্রন্থাগার পরিষেবা দুর্বল থাকার কারণে বরাবরই কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহে ছিল না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বজনপোষণের নিরিখে কর্মী নিয়োগ হতো। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানবসম্পদ বিকাশের পরিকল্পনার কোন ধারণা প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল না।

পঞ্চাশের দশকে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় যে স্পনসর্ড সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রবর্তন করা হয় গ্রামীণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রেও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ আবশ্যিক সর্ত ছিল না। ফলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত ব্যক্তিদের চাকুরির সুযোগের ব্যাপকতা ছিল না।

১৯৫৭ সালের রাজ্য সরকারের পে কমিশন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা শিক্ষণ, আবশ্যিক করে দেয়। সেই সময়ে ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষিত গ্রন্থাগার কর্মীর অভাব থাকায় বহু বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করতে পারেন নি। ১৯৬২ সালের ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধের পর গ্রন্থাগারিক নিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মানবসম্পদ বিকাশের মধ্যবর্তী পর্যায় হলো আরো কয়েকটি নতুন শিক্ষণ ক্ষেত্রের স্থাপনা।

ষাটের দশকে রহড়া রামকৃষ্ণমিশনের সার্টিফিকেট কোর্সের প্রবর্তন; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি লিব এসসি কোর্সের প্রবর্তন; সত্তরের দশকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থা থেকে প্রভূত পরিমাণে ছাত্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত হয়ে কর্মক্ষেত্রে হাজির হতে থাকে কিন্তু গ্রন্থাগার স্থাপনা এবং পদসৃষ্টি বেশী না হওয়ায় কাজের বাজার বরাবরই ছোট ছিল ফলে বহু শিক্ষিত কর্মী বেশ কিছুদিন বসে থাকতেন। এ রকম অবস্থায় সত্তরের দশকের গোড়ায় দিকে পরিষদ সার্টিফিকেট কোর্সের একটি সেকশন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। পরিষদ সেদিন মনে করেছিলো যে বৃত্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে বেকার থাকা বৃত্তির পক্ষে হানিকর।

১৯৫৮ সালে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে রঙ্গনাথন কমিটির সুপারিশ, ১৯৬২ সাল ইউ, জি, সির এতৎ সম্পর্কিত সার্কুলার দীর্ঘদিন যাবৎ চালু করা হয় নি। সত্তরের দশকের দিক থেকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের যোগ্যতা মাষ্টার্স ডিগ্রি তৎসহ গ্রন্থাগারে ডিগ্রী/ডিপ্লোমা চালু করা নিয়োগের ক্ষেত্রে আবশ্যিক শর্ত হিসাবে গ্রহণ করা হয় নি। এর ফলে কিছু কলেজ যেমন ইউ, জি, সি প্রবর্তিত শিক্ষাগত যোগ্যতা মেনে নিয়ে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করেছেন আবার বহু মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে কোন রকম শিক্ষা ছাড়াই কর্মী নিয়োগ করেছেন। ফলে কলেজে দ্বৈত শর্ত বহুকাল যাবৎ চালু ছিল। পরিষদের আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এ অবস্থার অবসান ঘটে বিশেষ করে পে-প্যাকেট স্কীম চালু হওয়ার পর থেকে।

বামফ্রন্ট সরকারের গ্রন্থাগার উন্নয়নসংক্রান্ত নীতিগুলি রাজ্যের গ্রন্থাগার ক্ষেত্রে মানবসম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। ১৯৭৮-৭৯ সালে ১০৬৩টি সাধারণ গ্রন্থাগার, ১৯৭৯-৮০ সালে ৫২০টি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত পরবর্তী ৫-৬ বছর মানবসম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রথম দিকে ১১০০ টির গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সহকারীর পদ খালি ছিল সাধারণ গ্রন্থাগারে; কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ধরলে আনুমানিক দেড় হাজারের মত পদ গ্রন্থাগারে খালি ছিল। অথচ হাতে শিক্ষিত গ্রন্থাগার কর্মী ছিল ৫-৬ শতর মত। ফলে প্রাথমিক স্তরে গ্রামীণ। প্রাইমারি ইউনিটের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট কোর্স আবশ্যিক ছিল না। পরবর্তীকালে এই যোগ্যতা আবশ্যিক করা হয়। এই সঙ্গে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ব্যবস্থা রাজ্য সরকার পুনরায় চালু করেন। এক্ষেত্রে তিনরকম শিক্ষাগত যোগ্যতা এখনও চালু আছে।

এখন বর্তমান পরিস্থিতি হলো সাধারণ গ্রন্থাগার ক্ষেত্রে আনুমানিক আট শতর মত পদ খালি আছে, কলেজের ক্ষেত্রে ডবল মাষ্টার্স ডিগ্রী আবশ্যিক করায় ঐরকম যোগ্যতা সম্পন্ন গ্রন্থাগারিকের অভাব আছে; কলেজের গ্রন্থাগারিক সহকারীর পদে সার্টিফিকেট শিক্ষণ আবশ্যিক না থাকায় যথেচ্ছ ভাবে নিয়োগ হচ্ছে।

শিক্ষণক্ষেত্রে পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে যা নজরে আসে তা হল সার্টিফিকেট স্তরে পরিষদের ১৮০ জন ছাত্র; রহড়ায় ৬০ জন; রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার শিক্ষণে আনুমানিক বছরে ১২০জন ছাত্র শিক্ষিত হচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বি, লিব, এসসি কোর্সে বছরে প্রায় ৩০০ জনের মত ভর্তি হচ্ছেন। এদের মধ্যে ডেপুটেশন ক্যাটাগরি বাদ দিলে বছরে ১০০—১৫০ মত নতুন ছাত্র সার্টিফিকেট পাশ করছেন এবং বি, লিব স্তরে দুই শতর মত ছাত্র বছরে কাজের বাজারে হাজির হচ্ছেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাষ্টার্স ডিগ্রী নিয়ে বছরে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জনের মত ছাত্র চাকুরী খুঁজছেন।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রথমদিকে যে বিশাল কর্মক্ষেত্র তৈরী হয়েছিল সেই পরিস্থিতি আর নেই। বিগত ৫-৬ বছর সাধারণ গ্রন্থাগারে নিয়োগ বন্ধ থাকায় দুহাজারের মত শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক চাকুরীর দুয়ারে ধর্ণা দিচ্ছেন। এই বিষয়টির সমাধান শুধু রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত হিসাবে বিচার করলে অন্যায় করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বহু প্রতিষ্ঠানে যে

হারে নিয়োগ করার কথা তা হচ্ছে না। তাদের তরফে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় না। বরং কর্ম সঙ্কোচন হচ্ছে। বিগত ৪।৫ বছর ধরে শোনা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সেকটরে ২ লক্ষের মত পদ খালি রয়েছে অথচ নিয়োগ হচ্ছে না। পদোন্নতি হচ্ছে না। অটোমেশনের ফলে বহুপদ তুলে দেওয়া হয়েছে পরিকল্পনা বিহীন ভাবে তফসীলভুক্তজাতি ও উপজাতিদের জন্য পদ সংরক্ষণ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের ফলে বহু পদ খালি থেকে যাচ্ছে। কারণ রেজাল্টভিত্তিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে SC/ST ছাত্ররা যথেষ্ট সংখ্যায় সফল হতে পারছেন না। তাছাড়া এদের কথা ইতিপূর্বে ভাবা হয়নি। ফলে নানাদিকে সংকট দেখা দিচ্ছে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রগুলির কর্মক্ষেত্রের আয়তনের বিষয়টি চিন্তাভাবনার মধ্যে না রাখার ফলে আরো জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সার্টিফিকেট পাশ করা ছাত্র এবং কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের B. Lib Sc Training এর সুযোগ দিচ্ছে না। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ সময়ের জন্য নিযুক্ত শিক্ষক ছাড়া এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চালানোর মত কোন রকম ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ব্যবস্থা না রেখেই সান্ধ্যকালীন কোর্স চালাচ্ছেন। নবগঠিত বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা খুব সুখের নয়। ছাত্রভর্তির ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রের আয়তন বিচারের মধ্যে থাকছে না। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অবহিত করলেও কোন সুরাহা হয়নি। ওপেন ইউনিভার্সিটিগুলিও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের দ্বার খুলে দিয়েছে; মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় করেস্পণ্ডেন্স কোর্সের ব্যবস্থা করেছেন। এই সব ঘটনায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের অবস্থা B.Ed শিক্ষণের মত কার্যকারিতা হারানোর দিকে ধাবমান। সামগ্রিকভাবে মানবসম্পদ বিকাশের পরিকল্পনায় যে বিষয়গুলি প্রভাবিত করছে তা হলো কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য/গ্রন্থাগার সংক্রান্ত নীতি, রাজ্য সরকারগুলির তথ্য/গ্রন্থাগার সংক্রান্ত নীতি, প্রাইভেট সেকটরগুলির গ্রন্থাগার ও তথ্য সংক্রান্ত পরিকল্পনা, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী নিয়োগ পদ্ধতি, বিদ্যালয় ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার সম্পর্কে শিক্ষক সংগঠনগুলির অনাগ্রহ, কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়োগনীতি ইত্যাদি। শিক্ষণ ব্যবস্থা ও নিয়োগ ক্ষেত্রের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। পরিস্থিতি ক্রমশঃ সঙ্কটজনক হয়ে উঠছে। সমাধানের দিক নির্দেশ আজ প্রয়োজন। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিক উভয় সংগঠনই শুধুমাত্র তত্ত্বগত স্তরে আলোচনায় ব্যস্ত। এই আলোচনায় সংকটের সমাধানের সূত্র পাওয়া যাবে কিনা তা বিচার হবে আগামী দিনে। রাজ্যস্তরেও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থার বিস্তারিত পর্যালোচনার প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মনে করে, রাজ্যের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে রাজ্যের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

ইতস্ততঃ

(স্মৃতিচারণ)

দ্বিতীয় খণ্ড, অষ্টাদশ পর্ব

প্রমীলচন্দ্র বসু

[উপাচার্য শ্রী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা]

ডক্টর রাধাবিনোদ পালের পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে এলেন কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও আইন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৯৪৬ সালের ১৩ই মার্চ তারিখে। এই সময়ে তিনি উপাচার্যপদে আসীন হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আদৌ নবাগত ছিলেন না। কার্যতঃ আরও সাতাশ বছর পূর্বে ১৯১৯ সাল থেকে তিনি নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে সেনেটের একজন ফেলো অর্থাৎ সদস্য এবং সিণ্ডিকেটেরও সদস্য ছিলেন। যতদূর মনে হয় এই সময় থেকেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের একজন অধ্যাপকও নিযুক্ত হয়েছিলেন। আরও দুবছর পূর্বে ১৯১৭ সালে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের সৃষ্টি হয় তখন থেকে তিনি ঐ বিভাগের আংশিক সময়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে ছিলেন। কাজেই উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত হবার পূর্বেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত নানা বিষয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।

অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। আর ছিলেন 'বাংলার বাঘ' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন স্রষ্টা ও রূপকার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অশেষ স্নেহভাজন জামাতা। আশুতোষের মৃত্যুর (১৯২৪ সাল) পর প্রায় বাইশ বছর কেটে গেলেও প্রমথ নাথের উপাচার্য পদে আসীন হবার সময়েও বিশ্ববিদ্যালেয়ে আশুতোষের প্রভাবে প্রায় পূর্ণ অস্তিত্ব ছিল। তাই এ সময়টাকে আশুতোষের যুগের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। নিজস্ব প্রতিভা গুণাবলী ও কর্মশক্তির বলে প্রমথ নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অসাধারণ শক্তি ও প্রভাবশালী ব্যক্তি বলে নিজেকে চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাছাড়া স্যার আশুতোষের জামাতা হিসাবেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্কিত প্রায় সর্ব শ্রেণীর লোকের কাছে বিশেষ সম্মান ও প্রীতির পাত্র ছিলেন। আমি ১৯৩৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেবার সময়ে এবং তার পরেও বহু বৎসর পর্যন্ত দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরানো দিনের অনেকে বিশেষতঃ নিম্নপদের কর্মীদের অনেকে যেহেতু তিনি আশুতোষের জামাতা ছিলেন সেই হেতু তাঁকে 'জামাইবাবু' বলে উল্লেখ করতেন। প্রিয়দর্শন প্রমথনাথকে স্বদেশী হোক আর বিদেশী হোক সব রকম পোশাকেই ভাল রকম মানাত। তবে আমাদের কর্মজীবনের অন্ততঃ প্রথম দিকে দেখেছি বেশীর ভাগ সময়ে সাহেবী পোষাক পরেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন। পরে অবশ্য ধুতি পাঞ্জাবী পরতেও দেখেছি কখনও কখনও। অন্যের ক্ষেত্রেও সাহেবী পোষাকটাই মনে হয় বেশী পছন্দ ছিল তাঁর। মনে আছে আমি বিদেশ থেকে ঘুরে আসার কিছুদিন পরে একদিন রেজিষ্ট্রারের ঘরে গিয়েছি কোন কাজে। মস্ত বড় ঘর। ঐ ঘরে তখন সতীশ বাবুও বসতেন। সতীশ বাবু সে সময়ে স্পেশাল অফিসার অথবা ট্রেজারার ঠিক কি ছিলেন, সে কথা মনে নেই। প্রমথ বাবু সতীশবাবুর কাছে বসেছিলেন। তিনি তখন উপাচার্য না থাকলেও সিণ্ডিকেট ও সেনেটের প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে প্রমথ বাবু কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে বলে উঠলেন, এ লোকটাকে ইউনিভার্সিটি থেকে বার করে দাও। আমি চমকে উঠলাম।

আরও বলছেন শুনলাম "ও যে আমেরিকা ইউরোপ ঘুরে এল সে পোষাক-আশাক কোথায় গেল? সেই মান্ধাতার আমলের ধুতি আর পাঞ্জাবী পরেই আসে ইউনিভার্সিটিতে"। তাঁর পাশে বসা ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত সতীশ বাবু দেখি মৃদু মৃদু হাস্য করছেন। বুঝলাম প্রমথ বাবু রহস্য করছেন রহস্যের প্রত্যুত্তরে সংযত ও বিনীতভাবে বললাম "আমার এই চেহারায় অন্য পোষাক মানাবে কেন? আপনার মত চেহারা হলে সাহেবী পোষাক পরা যাবে।" দুজনেই হেসে উঠলেন।

মানুষ হিসেবে প্রমথ বাবু হৃদয়বান ব্যক্তি ছিলেন। সেই সঙ্গে নিজের ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্বন্ধেও সর্বদা তাঁর তীক্ষ্ণ সচেতনতাও ছিল। তাঁর প্রতি আনুগত্যের অভাব না দেখালে তাঁর সাথে কারও কাজ করতে অসুবিধে না হবারই কথা। সে হিসাবে তিনি আমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্নই ছিলেন। যে সকল ব্যক্তি তাঁর গৃহে প্রায়ই যাতায়াত করতেন সাধারণতঃ তাঁদের প্রতিও তিনি প্রীত ছিলেন। আমার অবশ্য সে ভাবে তাঁর কাছে যাবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছাড়া অন্য কোন উপাচার্যের বাড়ীতে যাবার অভ্যাস আমার কোনদিনই ছিল না। বস্তুতঃ সে সময়ের রেওয়াজ মত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে এবং ব্যক্তিগত আকর্ষণে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর বাড়ীতে গেলেও অন্য কোন উপাচার্যের বাড়ীতে আমি কখনও যেতাম না। প্রমথনাথের অন্যতম ভ্রাতা শ্রী বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সহকর্মী ছিলেন। সে সূত্রেও তাঁদের বাড়ীতে আমি কদাচিৎ গিয়েছি। আশ্চর্যের বিষয় বিশ্বনাথ বাবু লাইব্রেরিয়ান পদে উন্নীত হবার পূর্বে এবং পরেও লাইব্রেরী সংক্রান্ত কাজকর্মে প্রমথবাবু সব সময়ে আমাকেই আহ্বান করতেন। এই ব্যাপারে আমি একটু অস্বস্তি বোধ করতাম। আমাকে তিনি পরিমল বলে ডাকতেন। সেটা যে ভুলবশতঃ ডাকতেন তা মনে হয় না। কারণ অনেক সময়ে নানা কাজে ও কারণে আমাকে যে সব 'স্লিপ' (slip) পাঠাতেন তার কোনটাতে পরিমল আবার কোনটাতে বা 'প্রমীল' লিখতেন।

আধুনিক কালের উপাচার্যদের মত তখনকার দিনের উপাচার্যেরা বেতনভুক উপাচার্য ছিলেন না। সেকালের উপাচার্যেরা ছিলেন অবৈতনিক। অন্য সূত্র থেকে যেমন জমিয়তি, ডাক্তারী, আইন ব্যবসা ইত্যাদি নিজ নিজ পেশা বা উপজীবিকার ক্ষেত্র থেকে তাঁদের সংসার নির্বাহের ও অন্যান্য বিষয়ে খরচপত্র চালাবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে হত। উপাচার্য নিযুক্ত হবার পর বেতনভুক উপাচার্য না হয়েও প্রমথনাথ প্রায় সর্বসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজেই নিজেকে নিযুক্ত রাখতেন। কাজেই তিনি আইন ব্যবসায়ে মনোযোগ দেবার বেশী অবসর পেতেন না। এযেন তাঁর নেশার ঘোরে কতটা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার অবস্থা। তবে এ কথাও সত্য আইন ব্যবসায়ে মনোযোগ দেবার অবসর না পেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যক্ষ ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের আংশিক সময়ের অধ্যাপক হিসাবে উপাচার্য থাকাকালে ডেপুটেশন থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঐ বাবদ তিনি যথাক্রমে মাসিক সাতশত টাকা ও দু'শ টাকা [illegible] একশ' টাকা পেতেন। পরে এই ব্যাপারে [illegible] পশ্চিমবঙ্গের অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের তরফ থেকে [illegible] জানানো হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার উভয়ের তরফ থেকে এই ব্যাপারে নিয়ম বহির্ভূত কাজের বিরুদ্ধাচরণ না করে ব্যাপারটি মানিয়ে নেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতে এই রকম ব্যাপার যাতে না ঘটে তার জন্যে সতর্কতামূলক বিধানের সৃষ্টি করা হয়।

তখনকার দিনের উপাচার্যদের ঐ পদগ্রহণে আর্থিক সুরাহা না হলেও ঐ পদের যথেষ্ট মান মর্যাদা ছিল। বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের ঐ পদে নিয়োগ করা হত। আর পদাধিকারীর নিজের ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলীর জন্যও পদের মর্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেত। অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তখনকার অবৈতনিক উপাচার্যদের কার্যকাল ছিল একাদিক্রমে দু বছর। প্রমথনাথের প্রথম দফার দু'বছরের কার্যকাল বেশ কৃতিত্বের সাথেই কেটেছিল।

ঐ কার্যকাল শেষ হলে তাঁকে পুনরায় দু বছরের জন্য উপাচার্য নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের কার্যকালের বেশীর ভাগ সময় বেশ ভালভাবে ও কৃতিত্বের সাথে কাটলেও শেষভাগে হঠাৎ বিশেষ এক গোলযোগের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি পদত্যাগ করেন। সেই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার কথা পরে হবে।

প্রমথনাথের বন্ধুপ্রীতির খ্যাতি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব রেজিষ্ট্রার যোগেশ চন্দ্র চক্রবর্তী মশায় ছাত্রাবস্থা থেকে তাঁর সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। যোগেশবাবুর বাড়ী ছিল মৈমনসিংহ (অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত) জেলায়। প্রমথবাবুর বাবা ছিলেন বর্ধমান জেলার লোক এবং জুডিসিয়াল অফিসার—বদলির চাকরি। শুনেছি প্রমথবাবু যখন স্কুলের ছাত্র তখন কোথাও যোগেশচন্দ্র কিছুদিন তাঁর সহপাঠী ছিলেন। আবার ম্যাকুট্রিলেশন পরীক্ষা পাশ করার পর উভয়েই পুনরায় প্রেসিডেন্সি কলেজে একত্রে পাঠ করতেন এবং কলেজে পড়ার সময়ে দু জনেই ইডেন [illegible] একই ঘরে বাস করতেন। উভয়ে একসঙ্গে আই. এ, বি. এ, এবং এম. এ পাশ করেন।

শোনা যায় প্রিয়দর্শন ও মেধাবী ছাত্র প্রমথনাথ ছাত্রাবস্থায় স্যার আশুতোষের দৃষ্টিপথে পড়েন এবং আশুতোষ তাঁকে জামাতারূপে পেতে আগ্রহী হন। আরও শোনা যায় যোগেশচন্দ্র নাকি এই ব্যাপারটা এগিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে সাহায্য করেন। অবশেষে আশুতোষের দ্বিতীয়া কন্যার সাথে প্রমথনাথের বিবাহ হয়। পরবর্তীকালে প্রমথনাথের বাড়ীতে যাঁদের যাতায়াত ছিল তাঁদের মধ্যে কারও কারও মুখে শুনেছি এই বিবাহ পতিপত্নী উভয়ের পক্ষে সুখের হয়েছিল তাঁদের গভীর দাম্পত্য প্রেমের কথা বিশ্ববিদ্যালয় মহলেও আলোচনা হতে শুনেছি অনেক সময়ে। এম, এ পাশ করার পর যোগেশচন্দ্র প্রথমে ভবানীপুর সাউথ সুবার্বণ কলেজে (পরবর্তী কালের আশুতোষ কলেজ) ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং কালক্রমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের পদ লাভ করেন। প্রমথবাবু যখন উপাচার্য যোগেশচন্দ্র সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার। প্রমথনাথ উপাচার্য থাকাকালে যোগেশচন্দ্র পরলোকগমন করেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যোগেশচন্দ্রের বিধবা স্ত্রীর জন্য একটা উপযুক্ত মাসিক পেনশন এবং অন্যান্য কিছু কিছু সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। সে সময়ে পরলোকগত বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদের পরিবারের জন্য ঐ রকম ব্যবস্থা সাধারণভাবে করা না হলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যবস্থা করা হত। যোগেশবাবুর পরিবারের জন্যও সে রকম ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

আমরা যোগেশচন্দ্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার হিসাবেই পেয়েছিলাম। তখনকার দিনের রেজিষ্ট্রারের বিশ্ববিদ্যালয়ে যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। তখন বেতনভুক উপাচার্যের প্রথা প্রচলিত না থাকায় অবৈতনিক উপাচার্যদের অর্থোপার্জনের জন্য সাধারণতঃ নিজ নিজ পেশা বা উপজীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সময় দিতে হত। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁরা সাধারণতঃ অপরাহ্নের দিকে কিছু সময়ের জন্য আসতেন। তখনও প্রো-ভাইসচ্যান্সেলর, ট্রেজারার এইসব পদের সৃষ্টি হয়নি ফলে রেজিষ্ট্রারের উপর কার্য পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব থাকত। দায়িত্ব থাকলে ক্ষমতাও আসে। রেজিষ্ট্রারদের সেজন্য যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। যোগেশচন্দ্র একজন বিচক্ষণ দায়িত্বশীল ও কর্মদক্ষ অফিসার ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রমথবাবুর অন্যান্য বন্ধু ছাড়া বয়সে তাঁর চাইতে কিছু বড় সতীশ চন্দ্র ঘোষ মশায় ছিলেন তাঁর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। সতীশবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। এক সময়ে পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত ছিলেন। আবার পরীক্ষা গ্রহণ বিভাগের নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজও করেছেন। অতঃপর তিনি ইন্সপেক্টর অফ কলেজের পদে নিযুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা স্তরের লোকজনের আলোচনা শুনে আমাদের মনে হয়েছে প্রমথবাবু উপাচার্য হিসাবে তাঁর কার্যকালের সুযোগমত কোন সময়ে সতীশবাবুকে

রেজিষ্ট্রারের পদে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য পেতে অভিলাষ পোষণ করতেন মনে। কিন্তু উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পদ হলেও ঐ ঝামেলার কাজ সতীশবাবুর পছন্দ ছিল না। তাই তিনি রেজিষ্ট্রারের পদে কাজ করতে রাজী ছিলেন না। পরে এক সময়ে অস্থায়ী রেজিষ্ট্রার হিসাবে কাজ করেছিলেন।

সতীশ বাবু প্রমথ বাবুকে কখনও তুমি' আবার কখনও বা 'তুই' বলে সম্বোধন করতেন। উভয়ের মধ্যে সর্বদা হাস্য পরিহাসও বিনিময় হত। প্রমথ বাবু উপাচার্য থাকাকালে একদিন সতীশ বাবু তাঁর বাদশাহী মেজাজে প্রমথ বাবুকে কি যেন একটা কাজ করার কথা বলছিলেন। কাজটা কিছুটা নিয়ম বহির্ভূত ছিল। তাই প্রমথ বাবু ঐ কাজ করার অসুবিধার কথা উল্লেখ করলে, শুনলাম সতীশ বাবু তাঁকে পরিহাস ছলে বলেছেন "এটাই যদি করতে না পারবি তা হলে তোকে আমরা ভাইস-চ্যান্সেলর করেছি কেন? নিয়ম কানুনের ধরা বাঁধা, গণ্ডীর মধ্যে, চলতে হলে রামচরণকে করলেই হত।" এই রামচরণ সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের হেড দারোয়ান। এই ধরণের ঠাট্টা তামাশা তাঁদের মধ্যে হামেশাই চলত বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে। বলা বাহুল্য সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া ছিল ঘরোয়া ধরণের।

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যোতিষ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁর কাছে অনেক জ্যোতিষী যাতায়াত করতেন। তিনি নিজেও তাঁদের সাথে জ্যোতিষ বিদ্যার চর্চা করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে কর্মরত কোন কোন ব্যক্তি জ্যোতিষ চর্চা করতেন। লোকে বলতো সেই জন্যই প্রমথবাবুর নেকনজরে পড়ায় আইন কলেজে তাঁদের চাকরি হয়েছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে তিনি 'প্লানচেট' প্রেতাত্মা নিয়ে আসা বিষয়ে বিশেষ অনুরাগী হয়েছিলেন। তাঁর নিজের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে, সে সময়ে তিনি বড় একটা বাড়ীর বাইরে বার হতেন না। কোন কারণে আমি একদিন তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সে সময়ে তিনি আমাকে বলেছিলেন প্রেতাত্মা সম্পর্কে তিনি চর্চা করছেন এবং ঐ বিষয়ে নিজে একখানা বইও লিখছেন। ঐ বই এর পাণ্ডুলিপি হিসাবে একখানা মোটা খাতাও আমাকে দেখিয়েছিলেন। জানি না সে পাণ্ডুলিপির এখন কি অবস্থা।

অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাচার্য থাকাকালে ভারতের রাজনৈতিক গগনে যে ঝড় ঝঞ্ঝার ঘূর্ণিবায়ু উত্থিত হয় তার প্রকোপ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তি ছিল না। ১৯৪৬ সালের ১৫ই আগষ্ট, মুসলিম লীগ ঘোষিত 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকে (Direct Action Day) উপলক্ষ্য করে কলকাতা শহরে যে ভয়াবহ দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি হয় তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরাচরিত ব্যবস্থাদি নানাভাবে বিপর্যস্ত হয় এবং কিছু সংখ্যক ছাত্রের মূল্যবান জীবন অকালে বিনষ্ট হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা লাভের কথা ঘোষণার পরেই ভারত ও বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নানা দিক আঘাতপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত [illegible] স্বাধীনতা লাভের পর দেশে পুনরায় প্রচণ্ড দাঙ্গা হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। এই সকল ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়কে যে সকল দুর্ভোগ ভুগতে হয় উপাচার্য প্রমথনাথের নেতৃত্বে দেশের শিক্ষাবিদ ও সংস্কৃতি সম্পন্ন ব্যক্তির যোগ্যতার সাথে তার যথাসম্ভব মোকাবিলা করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিখণ্ডিত বঙ্গদেশের পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা জগৎকে চরম বিপর্যয়ের মধ্য থেকে আত্মরক্ষা করতে সহায়তা করেন। উপাচার্য প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগের ফলে ঝাড়গ্রামের রাজা নরসিংহ মল্লদেব ঝাড়গ্রামে একটি কৃষি কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একলক্ষ টাকা ও ঝাড়গ্রামে চারশ পঞ্চাশ বিঘা জমি দান করেন।

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারিয়া পশ্চিম বঙ্গে সর্বপ্রথম ভারতীয় গভর্ণর নিযুক্ত হন এবং ঐ পদাধিকার বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম চ্যান্সেলর অর্থাৎ আচার্য নিযুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষাকে উপযুক্ত মর্যাদা দেবার জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ উত্থাপিত হয়ে আসছিল আচার্য

শ্রী চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারিয়া এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে সেই দাবীর প্রতিধ্বনি করে মাতৃভাষাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করেন। অতঃপর প্রমথনাথ উপাচার্য থাকাকালে বাংলা ভাষাকে উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত মর্যাদা দানের দীর্ঘদিনের সেই দাবী পূরণ হয়। এই সময়ে আই এ, আই, এস সি, বি,এ, বি,এস সি, এবং বি,কম পরীক্ষার্থীর প্রশ্নোত্তরের উত্তর বাংলাভাষায় লেখার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে উত্তর ইংরেজিতে লিখতে হত।

১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে (৩রা মার্চ) প্রেসিডেন্সি কলেজ সংলগ্ন মাঠে এক বিশেষ মণ্ডপ নির্মাণ করে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসাবে সভাপতিত্ব করেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর নাম প্রস্তাবিত হবার পর তিনি পঞ্চনদে গমন করেন। তখন যথাক্রমে ভারত শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা কালাম আজাদ এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদকে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত হবার জন্যে আহ্বান জানানো হয়। আজাদ সাহেবের কর্ম ব্যস্ততার জন্য এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদের স্বাস্থ্যের কারণে ঐ আমন্ত্রণ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। এই সময়ে এক শ্রেণীর ছাত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং তাদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার অভাব ক্রমশঃ গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠায় উপাচার্য তাঁর সমাবর্তন ভাষণে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন দেশবাসীর দৃষ্টি ঐ সমস্যার প্রতি আকর্ষণ করেন।

পূর্বে উল্লেখ করেছি নিজের পদমর্যাদা ও আত্মসম্মান সম্বন্ধে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় সচেতন ছিলেন। শুধু নিজের আত্মসম্মান নয় বিশ্ববিদ্যালয় তথা বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির মর্যাদা এবং সম্মান কেহ ক্ষুণ্ণ করলে তিনি তা বরদাস্ত করতে পারতেন না। খ্যাতনামা অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার সম্পর্কে এক ঘটনায় তাঁর এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

পাণ্ডিত্য এবং শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যবান অবদানের জন্য ১৯৪৯ সালে শিক্ষাব্রতী বিনয়কুমার সরকারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের সম্মান (Personal distinction of University Professer) দেওয়া হয়। ঐ বছরে আমেরিকার শিক্ষা জগতের আমন্ত্রণে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার আমেরিকায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য ঐ দেশে যান। সে সময়ে আমেরিকাবাসী জনৈক ভারতীয় অধ্যাপক সরকার ওদেশে ভারতের মর্যাদা হানিকর উক্তি করেছেন বলে ভারত সরকারের কাছে বিদ্বেষবশতঃ অভিযোগ করেন। ভারত সরকার এ বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিমত জানার আগে আমেরিকায় অধ্যাপক সরকার সম্পর্কে অনুসন্ধান করায় বিশ্ববিদ্যালয় ভারত সরকারের কাছে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তখন ভারত সরকার অভিযোগটি ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করে বিষয়টি পরিত্যক্ত হয়েছে বলে ঘোষণা করেন।

১৯৪৯ সালের মধ্যভাগে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের প্রতিনিধি হিসাবে অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কানাডায় এক শিক্ষা সম্মেলনে যোগদান করেন। সেখানকার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয় (Macgill University তাঁর গুণবত্তার স্বীকৃতি হিসাবে সেই সময়ে তাঁকে নানাবিধ ডক্টর অফ ল ডিগ্রি প্রদান করেন। এই সময়ে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আমন্ত্রিত ও সম্বর্ধিত হয়েছিলেন। কয়েকমাস পূর্বে তিনি গ্রেট ব্রিটেনে গিয়েও তাঁর কার্যাবলীর দ্বারা বিদেশের শিক্ষা জগতে এ দেশের সম্মান বৃদ্ধি করেছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের কার্যকাল শেষ হয়ে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিদায়প্রাপ্ত উপাচার্যকে অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রী দেওয়ার একটা প্রথা তদানীন্তন কালে প্রবর্তন হয়েছিল। প্রমথ বাবুকে কিন্তু তাঁর কার্য কাল শেষ হবার পূর্বেই সেনেটের সর্বসম্মত মতানুযায়ী ১৯৪৯ সালের আগস্ট মাসে (২৭শে আগস্ট) অনারারি ডক্টর অফ লিটারেচর ডিগ্রি দেওয়া হয়। এই সময়ে তিনি দেশে ও বিদেশে খ্যাতি ও সম্মানের তুঙ্গে অধিষ্ঠিত

ছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস একমাস সময়ের মধ্যে তাঁর এই সম্মানজনক অবস্থার ঘোর পরিবর্তন ঘটে গেল।

বেশ কিছুদিন যাবৎ বানিজ্য (Commerce) বিষয়ের পাঠক্রম, পাঠ ব্যবস্থা ইত্যাদি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ধ্যা-কালীন M. com ক্লাস খোলার দাবীতে কলকাতার ছাত্রদের মধ্যে আন্দোলন চলছিল। দীর্ঘদিনের মধ্যে ছাত্রদের এইসকল দাবী দাওয়ার কোন সুবিচার না হওয়ার অভিযোগে ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ছাত্রদের অসন্তোষ এবং আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। ধর্মঘট এবং বিক্ষোভের মধ্যে দিয়ে ছাত্রদের অসন্তোষ প্রকাশ পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং উপাচার্য প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনের নিকটে আন্দোলন উচ্ছৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলকাতার 'লোকসেবক' নামে দৈনিক সংবাদপত্রে ঐ বছরের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার তিনজন পরীক্ষার্থীর নম্বর সম্পর্কে দুর্নীতির অভিযোগের এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ কিছু নথিপত্রের ফটো সহ প্রকাশিত হয়। ঐ তিনজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে একজন ছিলেন উপাচার্য প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক পুত্র, দ্বিতীয় জন তাঁর এক পুত্রবধূ, এবং তৃতীয় জনকে তাঁর জ্যোতিষীর পুত্র বলে সংবাদে বর্ণনা করা হয়। অভিযোগে বলা হয় এই তিনজন পরীক্ষার্থীকে মূল পরীক্ষকগণ (Head Examiners) এবং ট্যাবুলেটাররা (Tabulators) অন্যায় ভাবে সেই নম্বর যথেষ্ট বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন।

সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রকাশ হলে চারিদিকে হৈচৈ পড়ে যায়। পরের দিনই সিণ্ডিকেটের এক সভায় উপাচার্য প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় বিষয়টি উত্থাপন করে তার অনুসন্ধানের কথা বলেন। অন্য এক সভায় সিণ্ডি-কেটের দুজন সদস্য এবং সিণ্ডিকেটের সদস্য নন অথচ সেনেটের সদস্য এমন তিনজন ব্যক্তিকে নিয়ে মোট পাঁচজনের এক কমিটি নিযুক্ত করা হয়। ঐ কমিটিকে ব্যাপারটির অনুসন্ধান করে এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিভাগের (Accounts Section) এবং ছাপাখানার বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ উত্থাপিত হয়। সিণ্ডিকেট সিদ্ধান্ত নেন যে উপাচার্যের সাথে পরামর্শক্রমে আচার্য আর একটি কমিটি নিযুক্ত করে সেই কমিটির উপরে এইসব অভিযোগের এবং অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ভার দেবেন।

যে পাঁচজনকে নিয়ে সিণ্ডিকেট কমিটি গঠিত করে-ছিলেন তাঁরা ছিলেন শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, (চেয়ারম্যান), বিচারপতি শ্রী আর, সি, মিত্র (রূপেন্দ্রকুমার মিত্র), ব্যারিষ্টার শ্রী এন বারওয়েল, সিটি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী অমিয়কুমার সেন এবং মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ দীনেশ চক্রবর্তী। এঁদের মধ্যে বিচারপতি মিত্র অন্যত্র কাজে ব্যস্ত থাকায় ঐ কমিটির কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না বলে জানান। মিঃ নোয়েল বারওয়েল সে সময়ে কলকাতায় অনুপস্থিত ছিলেন। তখন চেয়ারম্যান তাঁর উপরে ন্যস্ত ক্ষমতাবলে এই দুজনের জায়গায় ভূতপূর্ব উপাচার্য ডক্টর রাধাবিনোদ পাল এবং স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড জন কেলাস কে (Rev. John Kellas) কমিটির সদস্য হিসাবে গ্রহণ করেন।

এক সপ্তাহের মধ্যেই ২৪শে সেপ্টেম্বর উপাচার্য প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগ করেন এবং ঐ দিনই সিণ্ডিকেটের কাছে কমিটি তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। ঐ একই দিনে শ্রী চারুচন্দ্র বিশ্বাস দু বছরের জন্য উপাচার্য নিযুক্ত হন। তবে এই নিয়োগের সরকারী বিজ্ঞাপন ২৬শে সেপ্টেম্বর যখন সিণ্ডিকেটের সভার কাজ শুরু তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌছয়। সিণ্ডিকেট অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট গৃহীত হয় এবং সংবাদপত্রে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অনুসন্ধান কমিটি তাদের রিপোর্টে বলেন যে অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছে যে সত্যই ঐ তিনজন পরীক্ষার্থীর নম্বর পরিবর্তন করা হয়েছে। তবে এই দুঃখজনক ব্যাপারে স্বয়ং উপাচার্যের প্রত্যক্ষ কোন সংযোগের সন্ধান তাঁরা পান নি বলে কমিটি উল্লেখ করেন। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এই রকম অন্যায় একটি ঘটনা ঘটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি হিসাবে উপাচার্যকে এই ঘটনার দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে অব্যাহতি দেওয়াও কঠিন বলে কমিটি মন্তব্য করেন। সিণ্ডিকেট কমিটির রিপোর্ট আলোচনা হবার পরেই উপাচার্য প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগ করলেও সমস্ত ব্যাপারটির উপর যবনিকাপাত এখানেই ঘটে নি।

অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য চারুচন্দ্র বিশ্বাসের আমল শুরু হয়।

কর্মকালীন প্রশিক্ষণ (In-house training) সম্পর্কে কিছু কথা

নন্দিতা ভট্টাচার্য

১ ভূমিকা

যে কোনো পেশাগত ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মূল্য আজ সর্বজনস্বীকৃত। প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তত্ত্বগত শিক্ষাকে বাস্তবে রূপায়ণে পারদর্শী হওয়ার জন্য। প্রশিক্ষণ প্রয়োজন পুরোনো শিক্ষাকে নব্য জ্ঞানের আলোকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও রিফ্রেশার্স কোর্স-এর প্রয়োজনীয়তা আজ শিক্ষানীতির অঙ্গীভূত। গ্রন্থাগার বিদ্যা একটি পেশাগত বিদ্যা। এক্ষেত্রে নিয়মিত প্রশিক্ষণ অনুরূপ ভাবে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ—গ্রন্থাগার কর্মীদের কার্যিক কুশলতার স্তরে উন্নীত করতে ও লব্ধ-কুশলতার মানকে বজায় রাখতে।

২ প্রশিক্ষণ প্রয়োজনীয়তা

উপরিউক্ত প্রয়োজনীয়তাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন স্তরের ট্রেনিং : সার্টিফিকেট কোর্স, ডিগ্রী কোর্স, স্নাতকোত্তর কোর্স ইত্যাদি। কিন্তু এ বিষয়ে স্বাভাবিক ভাবেই কিছুকথা মনে আসে। তা হল ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল একটি দেশের অসংখ্য গ্রন্থাগার কর্মীর কত শতাংশ প্রথাগত প্রশিক্ষণ-এর সুযোগ পায়। উপরন্তু আরও একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে গ্রন্থাগার কর্মী হিসেবে অসংখ্য কর্মী পেশাগত কাজে নিয়োজিত রয়েছেন যাঁদের পেশাগত বা সাধারণ শিক্ষাগত কোনো ডিগ্রী নেই, এবং এই প্রযুক্তি কর্মীরা ছাড়াও অ-কুশলী অনেক কর্মী গ্রন্থাগারে কাজ করেন। উভয় পক্ষেরই প্রথাগত ডিগ্রী অর্জনে অনেক অসুবিধা বর্তমান। তাহলে কীভাবে এদের মানোন্নয়ন সম্ভবপর?

এখানেই দেখা দেয় কর্মকালীন প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কর্মস্থলেই কর্মীর মানোন্নয়ন।

৩ গ্রন্থাগার-প্রকৃত উদ্দেশ্য

মনে রাখতে হবে যে কোনো গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য গ্রাহক সমাজের সময়ের অপচয় না ঘটিয়ে ইপ্সিত তথ্য তাকে সরবরাহ করা। এরজন্য প্রয়োজন সুদক্ষ, পেশাগত জ্ঞানের অধিকারী নিষ্ঠাবান কর্মীর—যাদের কর্মকুশলতার উপর সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের সুনাম ও পরিচিতি নির্ভর করে। সুশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মী গ্রন্থাগারের তথ্য সংগ্রহের পরিপূর্ণ মূল্যায়ন ও ব্যবহার করে পাঠক সমাজের প্রয়োজনে লাগাতে সক্ষম হবে। যার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি গ্রন্থাগারের উজ্জলতর ভাবমূর্তি।

৪ কর্মকালীন প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য

জীবনের গতিশীলতার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে নানা নতুন চিন্তাধারার সংযোজন ঘটেছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই সংযোজন স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে চলেছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রয়োজন এই নবলব্ধ ভাবধারার সাথে সম্যক পরিচিতি। এরজন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণের। এ প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত প্রশিক্ষণের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি মনে রাখা উচিত :

(ক) কর্মকালীন প্রশিক্ষণের প্রথাগত ডিগ্রী ভিত্তিক শিক্ষার আসন সংখ্যার ও প্রার্থী-যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত। পেশাগত ডিগ্রী ধারী কর্মী ও সাধারণ কর্মী সবার সুযোগ রয়েছে এ ধরণের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার।

(খ) কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা তাদের জন্য যারা সদ্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্রের ডিগ্রী গ্রহণ করে কোনো গ্রন্থাগারে যুক্ত হয়েছে।

(গ) যারা বহুদিন পেশাগত ভাবে যুক্ত কিন্তু আধুনিক চিন্তাধারার সাথে পরিচিতিহীন।

(ঘ) যে সমস্ত কর্মী একটি সংস্থা ছেড়ে অন্য সংস্থায় যোগদান করেছেন—নবনিযুক্ত সংস্থার কর্মপ্রকৃতি যাদের অজানা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণ খুবই উপযোগী।

৫ এই ধরণের প্রশিক্ষণ কেন ?

সুষ্ঠু জনসংযোগ রক্ষা করে গ্রাহকের চাহিদা মেটানো গ্রন্থাগারের কাজ। এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নিয়মিত প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে কর্মীদের কাজের মানোন্নয়ন-এর দ্বারা। সুনিয়ন্ত্রিত, সুপরিকল্পিত কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা কর্মীদের কাজে প্রেরণা সঞ্চার করতে সহায়তা করবে—যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো গ্রাহক-পরিষেবার মানোন্নয়ন।

৬ পরিচালন ব্যবস্থার রূপরেখা

প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা কী ভাবে পরিচালিত হবে-নির্দিষ্ট সেশন-এর মাধ্যমে, নির্দিষ্ট কক্ষে না বিভিন্ন অংশে ভাগ করে, তা নির্ধারণের দায়িত্ব গ্রন্থাগার পরিচালন কর্তৃপক্ষের। ব্রিটেনে অনেক লোকাল লাইব্রেরী অথরিটি কেন্দ্রীয় শিক্ষণ দপ্তর প্রতিষ্ঠা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অন্তর্গত গ্রন্থাগারগুলির কর্মিগণের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা মূল্যায়নের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে গঠিত স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার (LLA) গুলির সীমিত আর্থিক সঙ্গতির মধ্য দিয়েও এ বিষয়ে অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালনের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। মেরী ক্যাষ্টেলীন তাঁর Planning Library Training Programmes বইয়ে এ বিষয়ে LAMSAC রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে প্রতি দু'শোজন কায়িক শ্রম করেন না এরূপ কর্মীর জন্য একজন প্রশিক্ষণ অফিসার নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। তিনি পূর্ণ সময়ের হবেন কিনা তা নির্ভর করবে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনের উপর। প্রশিক্ষণ অফিসারের উপর ন্যস্ত থাকবে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার পূর্ণ দায়িত্ব। সংস্থার বিভিন্ন অংশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মধারা, চাহিদা ইত্যাদি প্রণয়নের পরিপূর্ণ দায়িত্ব তাঁর উপর। এ বিষয়ে সহায়তার জন্য প্রতিটি গ্রন্থাগারের নিম্নলিখিত রূপরেখা অনুসারে একটি সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ নীতি থাকা প্রয়োজন :

(ক) কর্মীর যোগ্যতা উন্নয়নের বিষয়ে পরিচালন কর্তৃপক্ষের সচেতন প্রয়াস।

(খ) প্রতিটি স্তরের কর্মীরই প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে—এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সচেতনতা।

(গ) বিভিন্ন প্রথাগত ডিগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ-এর গুরুত্ব অনুধাবন।

(ঘ) পরিচালন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রশিক্ষণ পরিচালনার বিষয়ে প্রশিক্ষণ অফিসারের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা

(ঙ) নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রদেয় প্রশিক্ষণের উপযুক্ত প্রয়োগের মূল্যায়ন।

৭ প্রশিক্ষণের বাস্তব রূপ

কীভাবে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের প্রয়োজন অনুসারে পরিকল্পিত হবে এবং কিভাবে প্রদেয় শিক্ষাক্রমটির ব্যবহারিক মূল্য বজায় থাকে সামগ্রিক পরিকল্পনা ও রূপায়নের দায়িত্ব ও পলিটেকনিক অফিসারের। একজন অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক এই এরা ইউ হলে তিনি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের প্রকৃত প্রয়োজনের মূল সুরটি ধরতে সক্ষম হবেন এবং তদনুসারে প্রদেয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচীকে সাজাতে পারবেন।

সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের বা গ্রন্থাগার সমষ্টির (যদি LLA দ্বারা পরিচালিত হয়) শিক্ষণ সূচী প্রণয়নে জন্য তিনি সাধারণভাবে একটি বড়ো গ্রন্থাগারের নিম্নলিখিত বিভাগগুলি ও তাদের কর্মধারা সম্বন্ধে অবশ্য অবহিত হবেন :

(ক) গ্রন্থসঞ্চালন, সদস্যভুক্তি করণ, চাঁদা, ফাইন, পুস্তক সংরক্ষণ, গ্রন্থ সম্ভার রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি

(খ) রেফারেন্স, বিভিন্ন ধরণের অনুলয় পুস্তকের যথাযথ বিন্যাস, সংরক্ষণ ও তথ্য সরবরাহে ব্যবহার রীতিনীতি ইত্যাদি।

(গ) পত্র-পত্রিকা ক্রয়, গ্রহণ, তালিকা প্রস্তুতি, সূচীকরণ, লেন-দেন ইত্যাদি।

(ঘ) পত্র-পত্রিকা পরিগ্রহণ ব্যতীত অন্যান্য নথির অর্ডার, ক্রয়, পরিগ্রহণ ইত্যাদি।

(ঙ) সংগৃহীত নথির বর্গীকরণ, সূচীকরণ ইত্যাদি প্রকরণ (প্রসেসিং)।

(চ) বিশেষ ধরনের নথি—বিভিন্ন ধরণের অ-পুস্তক নথি যথা ম্যাপ, রেকর্ড ইত্যাদির যথাযথ বিন্যাস, সংরক্ষণ, ব্যবহার ইত্যাদি।

(ছ) ডকুমেন্টেশন—গ্রাহকদের চাহিদা অনুসারে নির্ঘণ্টিকরণ, সারসংক্ষেপ, আধুনিকীকরণ, ভাষান্তর।

(জ) প্রতিলিপি প্রণালী—বিভিন্ন ধরণের কপিকরার প্রণালীর পরিচিতি ও ব্যবহার।

উপরিউক্ত প্রধান কর্মধারাগুলি ছাড়াও রয়েছে প্রদর্শন, বাঁধাই ইত্যাদি।

প্রত্যেকটি বিভাগের প্রতিটি প্রধান প্রধান কর্মধারাকে বিশেষ বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত করে নিম্নলিখিত প্রণালীতে যোগদানকারী কর্মীদের প্রশিক্ষণে পারদর্শিতার রেকর্ড রাখা যেতে পারে যা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মূল্যায়নে সহায়তা করবে :

DIVISION ... A

TYPE OF WORK (What & When How of QUICK-REFERENCE MATERIALS)

CODE = a

GRADE OF PERFORMANCE :

EXCELLENT	= A +
GOOD	= A
FAIR	= B
POOR	− B

PARTICIPANTS SYMBOL = +V, +W, +X, +Z

COURSE ON A a

Participants (অংশগ্রহণকারী কর্মী)	Grade (মান)	Training Period (শিক্ষণকাল)	
		From	To
+V	A+		
+W	B		
+X	B		
+Z	−B		

উপরিউক্ত ধরণের রেকর্ড রাখা সম্ভব হলে সহজেই বোঝা যাবে কোন্ কর্মী কোন্ বিভাগের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। এই প্রশিক্ষণ ফলের ভিত্তিতে যদি গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগের কর্মী নিযুক্ত হয় তবে নিঃসন্দেহে কাজের মান বৃদ্ধি পাবে কারণ এ কথা মনে রাখতে হবে যে পেশাগত ডিগ্রীতে সমান ফলের অধিকারী দুজন কর্মী বাস্তব কর্মক্ষেত্রে দুটি পৃথক পৃথক কর্মধারায় পারদর্শী ও একনিষ্ঠ হিসেবে পরিচয় রাখতে পারেন। যে কর্মী সূচীকরণে নিপুণ সে অনুলয় সেবায় উৎসাহ নাও পেতে পারে। কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ভিত্তিক বিভাগীয় কর্মী নির্বাচন নিঃসন্দেহে প্রতিটি কর্মীর যথাযথ কর্ম নিযুক্তিতে সহায়তা করবে যা স্বাভাবিক ভাবেই কর্মীদের মধ্যে প্রেরণা আনবে।

উপরিউক্ত ধরণের প্রশিক্ষণের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে গ্রন্থাগারের ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিক দিয়ে এ ধরনের প্রশিক্ষণ অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটি প্রস্তুত হয়ে থাকে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের বিশেষ প্রয়োজন ও কর্মধারার আলোকে-যা অপূর্ণ থাকে প্রথাগত কোনো স্নাতকস্তর কোর্সে। বৃহত্তর অর্থে সমগ্র গ্রন্থাগার কর্মীর একত্রিত হয়ে বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা, অন্য গ্রন্থাগার পরিদর্শন ও স্বল্প-সময়ব্যাপী কর্মশালা ইত্যাদিও কর্মকালীন প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত।

৯ উপসংহার

কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কী ও কেন, পূর্বোক্ত আলোচনায় যে ছবিটি ফুটে উঠেছে ভারতীয় প্রেক্ষপটে তার তাৎপর্য পুনরুক্তির প্রয়োজন রাখেনা। কর্মীদের প্রেরণার মাধ্যমে গ্রন্থাগারের কাঙ্খিত গ্রাহক পরিষেবার মানোন্নয়ন করা সম্ভব হবে। প্রতিটি গ্রন্থাগার গ্রাহক পরিষেবার মাধ্যমে হয়ে উঠবে বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণ সাধনের অন্যতম অংশীদার।

দ্রষ্টব্য : লেখাটির জন্য কিছু তথ্য Planning Library Training Mary Castelyn, London, Andre Deutsch, 1987 থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

॥ কলেজ গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের কনভেনশন ॥

গত ২০ আগষ্ট, ১৯৮৯ তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে কলেজ গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী।

কনভেনশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সভাপতি তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে বলেন যে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, বিশেষতঃ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক গুলি ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কলেজ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে, যেখানে বেশ কিছু কাজ করা বাকি রয়ে গেছে। যেমন, ভারত সরকার মেহরোত্রা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ইউ. জি. সি. বেতনক্রমের সম্পর্কে যে আদেশনামা জারী করেন, সেই অনুযায়ী রাজ্য সরকার শিক্ষকদের বেতনক্রম সংশোধনের আদেশনামা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু গ্রন্থাগারিকদের বিষয়ে কোন সরকারী সিদ্ধান্ত জানা যায় নি। এ সম্পর্কে গ্রন্থাগার কর্মীরা ক্ষুব্ধ। এ ছাড়াও ১২. ৬. ৭২-এর আগে কর্মে নিযুক্ত গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করার বিষয়ে ইউ. জি. সি-র সার্কুলার এ রাজ্যে বলবৎ হয় নি। যে সমস্ত গ্রন্থাগারিক ৫৫০-৯০০ এবং ৭০০-১৬০০ টাকা বেতনক্রমে রয়েছেন তাঁদের বেতন এখনও ফিক্সেশন হয় নি, বকেয়া টাকাও তাঁরা পান নি। পদমর্যাদা ও চাকুরীর শর্তাবলী সম্পর্কেও সমস্যা রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকা শিক্ষকদের চাইতে কম নয়। কাজেই শিক্ষকদের সমমর্যাদা তাদের পাওয়া উচিৎ। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিধি (ষ্ট্যাটুট) পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দিল্লী, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমতুল বেতন ও পদমর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু এই সুযোগ এখানে নেই। মেহরোত্রা কমিটি গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা উন্নয়নের সুপারিশ করলেও এই সুযোগ গ্রন্থাগারিকরা পাচ্ছেন না।

কলেজ গ্রন্থাগারের পরিষেবার জন্য যে ব্যবস্থা রয়েছে, তার অবস্থা অত্যন্ত অনিশ্চিত ও সঙ্গীন। একটা নির্দিষ্ট অনুদান নীতি থাকা প্রয়োজন। কর্মীনিয়োগের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যাচ্ছে যে কোন স্টাফ প্যাটার্ন নেই। গ্রন্থাগার সহকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষা যোগ্যতা হিসাবে মানা হচ্ছে না। যদিও স্পনসর্ড সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে এই যোগ্যতা সরকার থেকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

মেডিক্যাকেল কলেজ ও পলিটেকনিকে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা রয়েছে। এরা ইউ. জি. সির আওতাভুক্ত না হলেও এদের ক্ষেত্রেও ইউ. জি. সির বেতন ও পদমর্যাদার সুপারিশ থাকা উচিৎ।

সর্বভারতীয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থাসমূহের ফেডারেশনের (AIFUCTO) সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মৃন্ময় ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে বলেন যে সভাপতির বক্তব্য যুক্তিযুক্ত এবং দ্বিমতের কোন কারণ নেই। সাংগঠনিক কারণেই দাবীগুলি মিটছে না। গ্রন্থাগারিকরা সংখ্যায় এত কম যে সবক্ষেত্রে খেয়াল করে তাঁদের দাবীগুলি নিয়ে সমান জোর দিয়ে কাজ করা হয় না। বিভিন্ন সংগঠন গ্রন্থাগারিকদের বিষয় নিয়ে চিন্তা করেন কিন্তু সবকয়টি প্রচেষ্টাকে একসঙ্গে নিয়ে আন্দোলন না করলে ফল পাওয়া যাবে না।

১৯৭৩ সালে গ্রন্থাগারিকদের দাবী না তুলে ভুল করেছিলাম; এবার সে ভুল হয় নি। কারণ বেশ কয়েকটি রাজ্যের গ্রন্থাগারিকরা বেশ সংগঠিতভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। ১৯৮৮ সালের ২২ জুলাই নির্দেশনামা

গ্রন্থাগারিকদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু গুজরাট, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ইত্যাদি কয়েকটি রাজ্য ছাড়া অধ্যাপকদের সঙ্গে গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে আদেশ এখনও প্রকাশিত হয় নি। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর প্রতিবাদ দিবস পালন করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদা শিক্ষকদের সমতুল বলে গণ্য করতে রাজী নন। তাঁরা এ্যাকাডেমিক স্টাফ হিসাবে স্বীকার করছেন। আঞ্চলিকভাবে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমমর্যাদা সম্পন্ন বলে স্বীকার করেছেন।

পরিশেষে তিনি আবার অনুরোধ করেন যে কনভেনশনের শেষে যাঁরা একই দাবী নিয়ে কাজ করছেন তাঁদের সবাইকে এক মঞ্চে নিয়ে আসতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির (WBCUTA) সম্পাদক অধ্যাপক আশিস রায় বলেন যে বিভিন্ন জেলায় সমিতির সভায় গ্রন্থাগারিকদের সমস্যাগুলি উত্থাপিত না হওয়ার ফলে বিষয়টি গুরুত্ব পায় না। বিভাগ সরকারের সঙ্গে আলোচনার সময় গ্রন্থাগারিকদের বিষয় বাদ যায় নি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট কলেজ গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদা নির্ধারণের জন্য এক কমিটি গঠন করেছেন। তার রিপোর্ট সিণ্ডিকেটের কাছে পেশ করা হয়েছে কিন্তু সিণ্ডিকেট এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেয় নি।

শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রশ্নে ডবল মাষ্টার্স ডিগ্রীর সুপারিশ আমরা সমর্থন করি না।

অধ্যাপক রায় প্রতিশ্রুতি দেন যে কনভেনশন থেকে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে তার প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জানাবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক মানিক বল বলেন যে এই কনভেনশন অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছে। আজ কলেজ গ্রন্থাগারিকরা যে সসম্ভ্রমে চলছেন তার কৃতিত্ব বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের। আজকের কনভেনশনের যে দাবীগুলি উত্থাপিত হয়েছে সেগুলির প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে।

বেতনক্রম সম্পর্কে আমরা ৪ জুলাই তারিখে গ্রন্থাগারিকদের বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম; সরকার ১৫ দিন সময় চেয়েছিলেন কিন্তু আজও সে আদেশনামা প্রকাশিত হয় নি। আমলাতন্ত্র সরকারের ইতিবাচক নীতিগুলি নষ্ট করার চক্রান্ত করছেন। আমি মনে করি BLA, WBCUTA এবং WBGCTA একসঙ্গে ডেপুটেশন দেওয়া উচিৎ।

পদমর্যাদার প্রশ্নে আমাদের মত হচ্ছে গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষক হিসাবে গন্য করতে হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই মত মানতে রাজী নয়; আবার রাজ্যস্তরেও নেতৃত্ব আমরা দিতে পারছি না; আমলারা বলছেন কলেজের গ্রন্থাগারিকরা 'group c' ষ্টাফ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটুট এ বলা আছে যে গ্রন্থাগারিকরা 'অ-শিক্ষক কর্মী নন'; তাহলে শিক্ষক বলতে আপত্তি কোথায়? তৃতীয় যে মর্যাদার কথা বলা হচ্ছে তাতো মেহরোত্রা মহাশয়ের কথার প্রতিধ্বনি।

কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের নিয়োগের পদ্ধতি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত।

অধ্যাপক বল যে কোন যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচিতে সমর্থন ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

সভাপতি অধ্যাপক আন্দোলনের তিন নেতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এরপর পরিষদের পক্ষ থেকে কনভেনশনের খসড়া প্রস্তাব সমূহ পেশ করেন শ্রীশৈলেন ঘটক। সমর্থন করেন শ্রীমতী সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়। প্রস্তাবের উপরে ১২ জন আলোচনা করেন।

আলোচনা:

১। নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের পক্ষ থেকে শ্রীমণিমোহন ঘোষ বলেন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইদিকে দু'টি কলেজের গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রমের ফারাক রয়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের গ্রন্থাগারিকরা ইউ জি সি হারে বেতন পান; কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম অনেক

কর্ম। সমযোগ্যতা সম্পন্ন হলেও তাদের বেতনক্রম সাধারণ কলেজের গ্রন্থাগারিকদের থেকে অনেক কম। দাবী সনদে মেডিক্যাল কলেজের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পায় নি। যাহোক পরিষদ এ সম্পর্কে সরকারের কাছে দাবী সনদ পেশ করলেও বিষয়টি সুরাহা হয় নি। এই দাবীগুলিকে জনসমক্ষে বেশি করে প্রচার করা প্রয়োজন। শ্রীঘোষ দাবিসনদে একটি সংযোজনী আনেন। সংযোজনীটি হলো "মেডিক্যাল কলেজের গ্রন্থাগারিক, উপ ও সহ-গ্রন্থাগারিকদের নিয়োগের শিক্ষাগত যোগ্যতা কলেজ গ্রন্থাগারের সমতুল করতে হবে।

২। রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজের পক্ষ থেকে শ্রী সৌরেন্দ্র কুমার ঘোষ দাবি সনদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন যে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনক্রম ফিক্সেসন হয়ে গেছে কিন্তু গ্রন্থাগারিকদের আদেশনামা প্রকাশিত হয় নি; রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার থাকা সত্বেও এ বৈষম্য কেন? কলেজ গ্রন্থাগারিকদের গুরুত্ব এবং কাজের চাপ শিক্ষকদের চাইতে কম নয়।

৩। প্রেসিডেন্সি কলেজের শ্রী শশাঙ্ক বাগচী বলেন যে দাবী সনদে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের যে নন-ভোকেশনাল ষ্টাফ হিসাবে দাবী করা হয়েছে তা অবমাননাকর। আমরা চাই ছুটিতে গ্রন্থাগার খোলা থাক, কিন্তু কোন রকম তকমা থাকা উচিৎ নয়। পরিষদের পক্ষ থেকে বিজ্ঞান সম্মতভাবে ষ্টাফ প্যাটার্ণ স্থির করে কলেজে কলেজে আলোচনার জন্য যেন পাঠানো হয়—তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ভাল।

৪। কলেজ লাইব্রেরীয়ান্স্ অ্যাসোসিয়েশনের শ্রীবলাইলাল বসু দাবীসনদের প্রতি সমর্থন জানিয়েও এই মত ব্যক্ত করেন যে মূল সমস্যা বেতনক্রম নিয়ে নয়—আন্দোলন প্রয়োজন পদমর্যাদার প্রশ্নে কারণ বর্তমানে কলেজ গ্রন্থাগারের নীতি প্রণয়নে গ্রন্থাগারিকদের কোন অধিকার নেই। স্টাফ প্যাটার্ণ সম্পর্কে তিনি মনে করেন যে সরকারের কাছে দাবী জানাবার আগে আমাদের নিজেদের মধ্যে যে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ছিল, সেটা করা হয়নি।

৫। পলিটেকনিক গ্রন্থাগারিকদের পক্ষে কৃষ্ণনগরের বিপ্রদাস পালচৌধুরী কলেজ অব টেকনোলজির শ্রীসত্যানন্দ মজুমদার বলেন যে কলেজের মর্যাদা নিয়ে পলিটেকনিক কলেজগুলির স্তর সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন ছিল। বাস্তব অবস্থা হচ্ছে পলিটেকনিক শিক্ষকদের পদনাম, বেতনক্রম, সবই কলেজ শিক্ষকদের অনুরূপ। ১৯৮১ সালে সরকার অন্য সব কর্মীর ক্ষেত্রে ইউ, জি, সি বেতনক্রম চালু করেন, বাদ পড়েন কেবলমাত্র গ্রন্থাগারিকরা। বৃত্তিমূলক শিক্ষাসংক্রান্ত ভারত সরকার নিয়োজিত দামোদরণ কমিটির সুনির্দিষ্ট সুপারিশ সত্বেও গত প্রায় ১৭ বছরে কিছুই হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দাবীসনদে পলিটেকনিক গ্রন্থাগারিকদের দাবী অন্তর্ভুক্ত করায় ধন্যবাদ জানান।

৬। কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতির পক্ষে শ্রীঅরুণলাল [illegible] বলেন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] কলেজ গ্রন্থাগারিকদের প্রতিনিধি হিসাবে প্রচেষ্টা সত্বেও উল্লেখযোগ্য কিছু করা সম্ভব হয়নি, একথা স্বীকার করতে বাধা নেই। পদমর্যাদার প্রশ্নে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন যে পদমর্যাদা পেতে হলে সবরকমের সাংগঠনিক পরিচয় ভুলে সকল গ্রন্থাগারিকদের ঐক্যবদ্ধ জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। দাবী সনদের ক-২তে উল্লেখিত কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলের প্রশ্নে-৩১.১২.১৯৭২ তারিখের পরিবর্তে ১৯৮১ সাল করার জন্য তিনি প্রস্তাব দেন।

৭। প্রেসিডেন্সী কলেজের শ্রীধ্রুব পাল দাবী সনদের খ-৪-এ উল্লেখিত দাবীটি এখনই না তোলার পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং খ-৫-এ যে কেরিয়ার এ্যাডভান্সমেণ্ট সংক্রান্ত বিষয় আছে, তা ক-১-এর সঙ্গে যুক্ত করা যায় কিনা ভাবতে অনুরোধ করেন। এছাড়া তিনি খ-৬-এ ভোকেশনাল কর্মী হিসাবে ঘোষণার দাবীকে অযৌক্তিক বলে মনে করেন।

ইত্যাদি সং গঠিত করার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে ইউ. জি. সি. কে পশ্চিমবঙ্গে একটি কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

(ঙ) কলেজ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির স্বার্থে ঃ

(ঙ-৯) কলেজ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নিয়মিত গ্রন্থন ও পত্র পত্রিকা ক্রয়, বাঁধাই আসবাব পত্র ক্রয় ইত্যাদির উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞান সম্মত অনুদান প্রথা প্রবর্তন করতে হবে এবং সেই নীতি অনুযায়ী ইউ জি. সি. ও রাজ্য সরকারকে নিয়মিত অনুদান দিতে হবে।

(ঙ-১০) কলেজ গ্রন্থাগারে পরিষেবার মান উন্নত করার উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞান সম্মত কর্মী-কাঠামো প্রবর্তন করতে হবে।

(চ) কলেজ গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মীদের সম্পর্কে ঃ

(চ-১১) গ্রন্থাগারের কাজকে সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে কলেজ গ্রন্থাগার সহকারী (লাইব্রেরী এ্যাসিস্ট্যান্ট) নিয়োগ কালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট আবশ্যিক শর্ত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

(চ-১২) কলেজ গ্রন্থাগারে লেনদেন কাজের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের সর্টার হিসেবে ঘোষণা করতে হবে এবং তাদের ক্ষেত্রে নূতন বেতনক্রম চালু করতে হবে।

(ছ) মেডিকেল কলেজ ও পলিটেকনিকের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে ঃ

(ছ-১৩) শিক্ষা বিভাগের অধীনে কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে যে বেতনক্রম ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা চালু হয়েছে বা ভবিষ্যতে হবে অনুরূপ বেতনক্রম ও সুযোগ সুবিধা মেডিকেল কলেজ ও পলিটেকনিকের গ্রন্থাগারিক/সহ-গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রেও চালু করতে হবে।

এই কনভেনশন উপরোক্ত দাবী সনদ আদায়ের জন্য অন্যান্য সংগঠনের সহযোগিতায় আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদেকে অনুরোধ জানাচ্ছে, পর্যায়ক্রমে যে কর্মসূচী গ্রহণের জন্য এই কনভেনশন সুপারিশ করছে তা হল :-

(ক) মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর নিকট ডেপুটেশন

(খ) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট ডেপুটেশন

(গ) রাজ্যব্যাপী কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের গণ ডেপুটেশন ।।

ENGLISH ABSTRACTS

of the articles etc. of 'GRANTHAGAR'

Prepared by P. Jana

Vol. 39 (June-July, 1989), No. 3

Editorial : Price rise of papers. P. 54-45.

The price of printing papers has tremendously gone up during the last one year. This price rise, combined with increased postage and high production cost has considerably affected the publication industry. Consequently, the escalating cost of newspapers, periodicals, books etc. has been restraining the libraries from acquiring essential reading items. Big newspaper producers may adjust this increased production cost through advertisements. But small newspapers and periodicals with limited finance, which record intellectual, literary, cultural and art[illegible]ies of individuals. are gasping for life. Some Associations are being fo[illegible]curtail their ess[illegible]ntial pu[illegible]cations, mainly meant for the communication link among the members. Nearly [illegible] hundred paper mills of various sizes are now closed, resulting the cost of white prints going up, reducing the publication of serious books and increasing the price of text books. This depression in publication industry is made for propagating the biased information of the govt through radio and television. Ultimately this price rise of papers is retarding the free flow of information, progress of art, literature and culture, and is restraining the fundamental right of the citizen, freedom of speech and opinion. Radio and television are in no way a substitute for the published materials.

Reminiscences : Pramil Chandra Bose. P. 56-60

The author recalls his impression about Dr. Bidhan Chandra Roy, since 1942, as the Vice-Chancellor of Calcutta University, after Ajij-ul-Haque. During Dr. Roy's vice-Chancellorship, the country faced a critical situation due to the impact of the 2nd World War, a terrible damage due to natural calamities, and the Quit India movement and the students' unrest. A vast quantity of rare and valuable

manuscripts and books of Calcutta University Library had to be shifted to the Nawab's Palace in Murshidadad, to avoid destruction. He also states how Moulana Abul Kalam Azad was selected to deliver 'Kamala Memoial' lecture for the topic 'The mutual interaction of Muslim and Indian culture : their synthesis and development : He mentions about the creation of a few chairs of Professors in the names of persons like Sir Nilratan Sarkar, Sir Gurudas Bandyopadhyay and an award of memorial scholarship donated by Alfred Klerk Edwards, a former Registrar of Calcutta University. The author points out that Dr. Roy had an intimate relation with Dr. Syama Prosad Mukherjee, though the latter was much junior to him.

The Appointment in Public Libraries and the Training Procedure : Amalangshu Sengupta p. 61-64.

The author highlights the appointment requirements, criteria and the categories of employees in a Public Library. He enumerates a public librarian's responsiblities, the nature of the efficiencies required, and about his relationships in the organiational set-up. Selection of a right entrant is always a complex task and is determined by several factors viz. qualification, experiences, reservation imposed, preference to local candidates and the selection procedure. Professional employees have their first training in the professional courses they undergo, and continue it throughout their service life, right from their joining and introductlon, by meetings, refresher courses, in-service trainings, internal transfer, taking part in seminars, workshops, exchange of professional schemes, and so on. Termination of the service life does not imply the end of the training.

Population information of Bangladesh : communication channels : Mirza Md. Rejaul Islam. P. 65-71.

The author states that one of the major causes of the economic problem of Bangladesh is its uncontrolled growth of population. As the rate of increment stands, the present population of 105 million is expected to become 160 million by 2000. Steps of family planning taken by the Government of Bangladesh as a measure against the population explosion, is partly effective only in the urban areas and the author confirms this only due to the lack of relevant information among the rural

community. He explains the role of appropriate information with supporting data in bringing about the desired success of any project. Bangladesh Government is aware of it and has created two departments viz. 'Information & Motivation' and 'Information Management'. But their activities have not yet reached the grass root level. The role of different information media is very important in this communication channel and professional librarians and information workers have a significant scope in moulding up the public mind qualitatively. City and town dwellers have many opportunities along with T. V. facilities, to be properly informed in any respect. Well organized libraries and information centres in every union with qualified professionals may supply the necessary infoamation in respect of population control and family planning programme, to the rural public. He also suggests ways as to how a library may effectively disseminate the necessary information relating to family planning and other population control projects through the arrangement of various extension services and may contribute much in generating public consciousness as a centre of the developmental process.

National Education Policy and Libraries : Barun Chattopadhyay p. 72—75

The author justifies the relevance of libraries with the 'National Education Policy'. He mentions about the same of 1986, issued by the Ministry of Human Resources and its recommendations relating to books and libraries, in details. He also identifies that it did not specify the role and significance of the librarian in a library, nor did it foresee any national library system and network. He points out that various education commissions for secondary as well as university education recognized and recommended in their reports, about the importance and utility of the libraries, in the field of education. However, the report of the committee headed by Prof. Debiprosad Chattopadhyay, submitted to the Government of India in 1988, contains some favourable recommendations for the libraries, to be implemented during the 8th Five-year Plan. The author differs in his opinion regarding the emphasis on computer application in libraries in India. He appreciates the prospect of library provision for the children. National policy on libraries and information must be in harmony with the national education policy.

Book Review : Pradip Chowdhury. p. 76

'Kalikata Tarikh Abhidhan'—date-wise dictionary on Calcutta, compiled by Dibyendu Sinha, & published by Ananda Dhara, Calcutta, in 1989, has been reviewed by Pradip Chaudhury. In Spite of some inherent deficiencies, the work is unique and the author's effort is highly commendable.

Vol. 39 (July-August, 1989), No. 4

Editorial : Organize a protest movement. 78-79.

Four members of the State Library Council and associated with Bengal Library Association decided to boycott the meeting of the Council in protest, since representatives of the Sponsored libraries were not invited to it. The invitation was expected due to some recent dev[illegible]ong BLA, PLEA and the State Library Minister and even in a meeting wi[illegible] Sri Budhadeb Bhattacharya, settlement of all long [illegible]tes was proposed. However, this proposal of conciliation could not be realized. The Library Workers are now to some extent frustrated and may ultimately forced to organize a joint movement. The Public Libraries in the State have already suffered a great loss due to lack of mutual cooperation. It has a far reaching effect. The Library Minister should be made aware that proper devolopment of the State Public Library System must have the spontaneous zeal and effort of the professional bodies and the employees concerned.

Reminiscences : Pramil Chandra Basu. p. 80-85.

Sri Basu portrays a vivid personal picture of Dr. Radhabenode Pal, who followed Dr. B. C. Roy as the Vice-Chancellor of Calcutta University in 1944. The woking atmosphere of the University was slowly becoming normal. Some reflections of Muslim League and the Secondary Education Bill were visible in the Senate. A chair of professor in the name of Acharya P. C. Roy was created.

During the tenure of Dr. Pal some Diploma Coursesviz. Library Science, Social work, Journalism, Home Science etc were started by the Univereity. The University Librarian Dr. Nihar Ranjan Roy was appointed as the Bagiswari professor of the University, Sri Biswanath Bandyopadhyay was promoted to the post of the University Librarian, and Sri Bose became the Deputy Librarian in his place. References to the appointment of Muslim employees, improvement of the Examination Section and convocation are provided in details. Dr. Syamaprosad Mukherjee's significant influence in the affairs of the University slowly came to an end.

Information & Information Scientists : Puranjay Mukhopadhyay. p. 86 89.

The meaning of the term 'information' is explained. The ways by which information is received and interpreted by our senses are also stated. The characteristics of information and its utility in decision making, are given. The extensive realm of information and the form and modfication it undergoes, must be noted. Nature and dissemination of info[illegible] depends on its source, generator, medium, receptor and its relevant pu[illegible] libraries are [illegible]ow cons[illegible]red as information centres. Information is vita[illegible] human exis[illegible] of any kind. Information services necessitate more and more [illegible]e of information explosion. Librarians as information scientists m[illegible] of their present role.

Searching for the definition of information—an effort : Benodebihari Das & Nandadulal Basak. p. 90-95.

Information is indispensable for human existence. Views of eminent scientists like Kochen, Brooks, Belking etc. in this respect have been reviewed. How the meaning of the term 'information' varies in connection with its different use, has been discussed. An outline of the different aspects of information science, has been given. Mutual relationship among the terms 'information', 'knowledge' and 'wisdom', as it stands according to an information scientist, has been shown. An attempt to define 'information' has been made at the end.

Library Association News : P. 96.

West Bengal Public Library Employees Association, Howrah District Branch.

submitted a memorandum containing eight demands, before the District Library Officer, Howrah, on 12th July, 1989. The Association also organized a convention in the District Library on 26th July, 1989.

Library News : p. 96.

Baharampur Girls' College Library organized a book exhibition and study circle concerning the criticism of 'Rabindra Sahitya' on 7th August, 1989.

Foreign Visitors to Association. p. 96.

A group of Chinese delegates, comprising eminent librarians visited Bengal Library Association on 5th May, 1989. They were informed about the activities of both BLA and IASLIC.

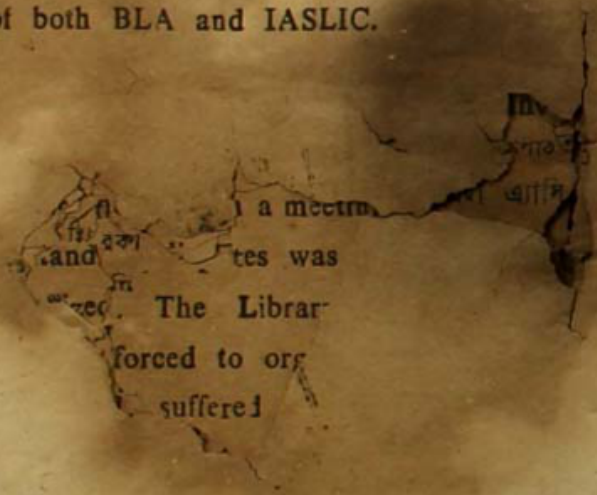

Annual subscription : Rs. 36.00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/GC-CL—2
Postal Regd.NO. WB/CC—145
Regd. No RN. 2674-47

Volume 39 No 5 Aug-Sept. 1989

প্রকাশিত হয়েছে

রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার

ও

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী

• রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত চিন্তার বিস্তারিত আলোচনা। • রবীন্দ্র প্রসঙ্গ গ্রন্থপঞ্জীতে এক হাজারের মত রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত বইয়ের টীকা সম্বলিত পঞ্জী। বিভিন্ন ধরণের নির্ঘণ্ট সম্বলিত।

[illegible] কুড়ি টাকা ॥

[illegible] ও অশোক গোস্বামী সঙ্কলিত

বিজ্ঞানের [illegible]

[illegible] বিজ্ঞানের শব্দাবলীর বাংলা [illegible]

[illegible] বানানোর উপযোগী [illegible]

[illegible] পঁচিশ টাকা ॥

পাওয়া যাচ্ছে

আদিত্যকুমার গুহদেবায়ত [illegible]

গ্রন্থবিন্যাস

৩য় সংস্করণ ১৯৮৪

শোভন সংস্করণ—পঁচিশ টাকা

সুলভ সংস্করণ—কুড়ি টাকা

গ্রন্থাগারিক

ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী

শোভন সংস্করণ—চল্লিশ টাকা

ছাত্র সংস্করণ—বত্রিশ টাকা

Printed & Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Calcutta—700 073.
General Office : P-134 CIT Scheme 52 Calcutta-700 014 Phone : 29-8466
at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 006
Editor : Ramkrishna Saha

[illegible] a meetin[illegible]
[illegible]and [illegible]tes was
[illegible]ec[illegible] The Librar[illegible]
forced to or[illegible]
[illegible] suffered

MANAGER
CALCUTTA

আর.এল.ও.
R.L.O.
28.12.89

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY
UNIVERSITY

28 MAR 1990

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৯, সংখ্যা ৭ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৬, কার্ত্তিক

সূচী

পৃষ্ঠা

এবারের গ্রন্থাগার দিবস : সম্পাদকীয় ১৬৬

প্রমীলা চন্দ্র বসু

ইতস্ততঃ (স্মৃতিচারণ)

গিরিজাপতি মুখোপাধ্যায়

সূচীকরণ সংহিতা : নীতি ও সমীক্ষা

পত্রিকা সমালোচনা

গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ

গ্রন্থাগার সংবাদ

ENGLISH ABSTRACTS

CALCUTTA

প্রচ্ছদ : অমিত পাল

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি আই টি স্কীম ৫২
কলিকাতা ৭০০০১৪

তথ্য বিশ্লেষণ ও সংহতকরণ সম্পর্কিত কর্মশালা

(Information Analysis And Consolidation)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগের NISSAT পরিকল্পনা অনুযায়ী আর্থিক সহায়তায় 'তথ্য বিশ্লেষণ ও সংহতকরণের'। Information Analysis & Consolidation বিষয়ে এক কর্মশালা আগামী ১৫-২১ জানুয়ারী ১৯৯০ তারিখে পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হবে।

এই কর্মশালা পরিচালনা করবেন অধ্যাপক গণেশ ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক এস সীতারাম। ডি. আর. টি. সি. ব্যাঙ্গালোর।।

ন্যূনতম যোগ্যতা—বি লিব এস সি ও সমতুল। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৯। কর্মশালায় অংশ গ্রহণ বাবদ কি: ১০০·০০ টাকা। আসন সংখ্যা: ৪০।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। আবেদন পত্র পরিষদে পাঠানো যাবে।

তাং ৯ নভেম্বর, ১৯৮৯

স্বা: রামকৃষ্ণ সাহা
পরিচালক, কর্মশালা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বর্ষ ৩১, সংখ্যা ৭ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৬, কার্ত্তিক

সম্পাদকীয়

এবারের গ্রন্থাগার দিবস

২০শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস'—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। গ্রন্থাগার দিবসের মূল তাৎপর্য হলো সারা পঃ বঙ্গে এই দিনটি 'গ্রন্থাগার আন্দোলন' দিবস হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে। ১৯২৯ সালের ২০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এ রাজ্যে সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। নানা কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলন ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়েছে। রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিকাশ, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলেজ গ্রন্থাগার সমূহের সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ প্রভৃতি ঘটনা আশানুরূপ না হলেও গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতির নিদর্শন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে যদিও অনেক রাজ্যে গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কিন্তু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ততটা পরিলক্ষিত হয় না যতটা এ রাজ্যে বিগত বারো বছরে দেখা গেছে। অনেক রাজ্যে গ্রন্থাগার পরিষদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়ন, গ্রন্থাগার কর্মীদের পদমর্যাদা, দায়িত্ব, ও কর্তব্য সম্পর্কিত সচেতন নেতৃত্ব অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলেও উপরিউক্ত বিষয়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব দানে পরিষদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ২০শে ডিসেম্বর তারিখটি তাই আত্ম সমীক্ষার দিন, গ্রন্থাগার আন্দোলনের সবলতা ও দুর্বলতার মূল্যায়নের দিন। পরিষদের আহ্বান হলো এই দিনে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন যে বিগত বছরের কর্মকাণ্ডের সাফল্যগুলি, পরিষেবা সমূহের মূল্যায়ন, পাঠক সৃষ্টির প্রয়াসে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের ভূমিকার পর্যালোচনা, রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার দপ্তর, স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার প্রভৃতি সংস্থার ভূমিকার ও মূল্যায়নের দিন। আগামী দিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার দিন ২০শে ডিসেম্বর। বিভিন্ন সভা, সমাবেশ, পোষ্টার, প্রদর্শনী প্রভৃতি পক্ষকাল ব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলির বক্তব্য জনসমক্ষে হাজির করা হয়ে থাকে।

রাজ্যে নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন, সমস্ত ধরণের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি সমৃদ্ধতি ও সম্প্রসারণ, গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সংযোগ সাধন, প্রতি উচ্চমাধ্যমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন, জনসাধারণের মধ্যে পাঠাভ্যাস ও পাঠস্পৃহা বৃদ্ধি, গ্রন্থাগারগুলির পরিষেবার উন্নয়নকল্পে অনুদান বৃদ্ধি, গ্রন্থাগারগুলির পরিচ্ছন্নতা বিধান, গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনও পদমর্যাদাসহ অন্যান্য সমস্যার সমাধানের দাবী সমূহের স্মরণ ও সম্প্রচারই গ্রন্থাগার দিবসের প্রধান বক্তব্য।

গত বছর গ্রন্থাগার দিবসের কেন্দ্রীয় সভার অনুষ্ঠানটি ছিল গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক অধ্যায়। ঐ দিনে বিধাননগরে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের (ILA) এবং ভারতীয়

বিশেষ গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র পরিষদ (IASLIC) এর সম্মেলন দুটি যৌথভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে সর্বভারতীয় সংস্থাদুটির সম্মেলন যৌথভাবে অনুষ্ঠানের দায়িত্ব কোন পরিষদ গ্রহণ করেছিলেন এরকম শোনা যায় নি। ঐ সম্মেলনের সাফল্য সংগঠিত আন্দোলনের সাফল্যের নজির। রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থা, গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্মেলনকে সফল করার একনিষ্ঠ প্রয়াস এই আন্দোলনের প্রতি জনসমর্থনের প্রতীক।

এবারের 'গ্রন্থাগার দিবস' অনুষ্ঠিত হবে ভিন্ন এক পরিস্থিতিতে। কেন্দ্রে নতুন সরকার গঠিত হবে। নবম লোকসভার নির্বাচনের দিন স্থির হয়েছে ২১-২৬ নভেম্বর। প্রত্যেক মানুষের দৃষ্টি এখন সেদিকে। যাঁরা রাজনৈতিক দলের কর্মী তাঁরা দিনরাত্রি পরিশ্রম করছেন তাদের দলকে জয়ী করার জন্য। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান করার কাজে ব্যস্ত। বিভিন্ন নাগরিকরা কে কাকে ভোট দেবেন এই চিন্তায় ও আলোচনায় ব্যাপৃত রয়েছেন। পোষ্টার, দেওয়াল লিখন, মিটিং, মিছিল, প্রভৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন দল যেমন প্রচারে ব্যস্ত আবার রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে নানা প্রকারে, নানা সুরে শাসকদলের পক্ষে জনমতকে প্রভাবিত করার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে।

দেশের মানুষ এক অভূতপূর্ব অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়েছেন। ১৯৮৪ সালের পরিস্থিতি আর নেই। সে সময় তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর মর্মান্তিক হত্যায় বিমূঢ় মানুষ আবেগতাড়িত হয়ে শাসকদলকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু পাঁচবছরে গঙ্গা-যমুনায় প্রভূত জল প্রবাহিত হয়েছে, এ বছর নির্বাচনে সরকারের কাজকর্মের মূল্যায়ন হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডল দূষিত হয়ে উঠেছে কয়েকটি বিপজ্জনক ঘটনার ফলে। ঠিক নির্বাচনের প্রাক্কালে ধর্মীয় উন্মাদনার বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে। সাম্প্রদায়িক বক্তব্য রাখা হচ্ছে জনসাধারণের সামনে। ধর্মীয় বাতাবরণের আড়ালে কুৎসিত রাজনৈতিক অভিসন্ধি ঢেকে রাখা হচ্ছে। এই অভিসন্ধি কিছুদিনের মধ্যেই হয়ত প্রকাশিত হবে। আনন্দের বিষয় অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের তুলনায় পঃ বঙ্গের মানুষ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় অধিকতর বিশ্বাসী।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম কাজ হলো জনসাধারণের সুস্থ সংস্কৃতির সম্প্রসারণে সাহায্য করা। বিভেদমূলক, দ্বেষমূলক, হিংসাশ্রয়ী বক্তব্যের বিরুদ্ধে গ্রন্থাগারগুলিকে তৎপর হতে হবে। নির্বাচন আসবে, যাবে কিন্তু রেশ থাকবে। রাজ্যের অধিবাসীরা যাতে শান্তিতে সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করতে পারেন তার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করার কাজ গ্রন্থাগার সমূহ উপেক্ষা করতে পারে না। এজন্য গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষ, গ্রন্থাগার পরিচালক, গ্রন্থাগার কর্মীদের অতিরিক্ত একটি দায়িত্ব এসে গেল। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে এমন কোন বই, পত্র-পত্রিকা রাখা উচিৎ নয় যা সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেয়। গ্রন্থাগার কর্মীদের এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্তব্য।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার
কর্মী সমিতির যৌথ উদ্যোগে
২০শে ডিসেম্বর
কনভেনশন
আলোচ্য বিষয় : সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও বর্তমান পরিস্থিতি
স্থান : ভারত সভা হল : সময় : বেলা ২ টা
দলে দলে যোগ দিন

ইতস্ততঃ

(স্মৃতিচারণ)

দ্বিতীয় খণ্ড, বিংশতি পর্ব

প্রমীলচন্দ্র বসু

[উপাচার্য বিচারপতি শ্রী শম্ভুনাথ ব্যানার্জীর সময়ের কথা]

শ্রী চারুচন্দ্র বিশ্বাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ ত্যাগ করে চলে গেলে ১৯৫০ সালের ১১ই মে তারিখে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী শম্ভুনাথ ব্যানার্জী এলেন দুবছরের জন্য পরবর্তী উপাচার্য নিযুক্ত হয়ে। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টিকাল থেকে এ পর্যন্ত নিযুক্ত ৩৮ জন উপাচার্যের সকলেই ছিলেন অবৈতনিক। সেই অবৈতনিক উপাচার্যের ধারার শেষ উপাচার্য ছিলেন বিচারপতি শ্রী শম্ভুনাথ ব্যানার্জী। এঁর সময়ে ১৯৫১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে এক নতুন আইন পাশ করা হল। ১৯৫১ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন নামে সেই নতুন আইনে বেতনভোগী উপাচার্য নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ১৯৫১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের এক বিজ্ঞপ্তি মারফৎ এই নতুন আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য নিযুক্ত করলেন। পূর্ববর্তী আইনে নিযুক্ত উপাচার্য বিচারপতি ব্যানার্জীর দুবছরের কার্যকাল তখনও শেষ না হলেও নির্দেশমত তিনি সঙ্গে সঙ্গে উপাচার্যের পদ ত্যাগ করলেন। তবে আচার্য নতুন আইনে অন্য কাউকে প্রথম উপাচার্য না করে বিচারপতি শম্ভুনাথ ব্যানার্জীকেই নতুন আইনের প্রথম উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। আচার্যের এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ ১৯৫১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের অধিবেশনে সেটি উত্থাপিত হয়। সেই অধিবেশনে সেনেটের সদস্যরা তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রথম উপাচার্য হিসাবে অভিনন্দন জানান। এই সময়ে নতুন আইন অনুযায়ী উপাচার্যের পদ পূরণ করা হলেও নতুন আইন পুরাপুরিভাবে প্রবর্তন করা হয় নি। তা হয়েছিল যতদূর মনে হয় ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে—সম্ভবতঃ ১২ই মার্চ তারিখে। তা হলে দেখা যাচ্ছে বিচারপতি শম্ভুনাথ ব্যানার্জী এক যুগ সন্ধিক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। একদিকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো আইন অর্থাৎ ১৯০৪ সালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের (Indian University Act) ধারামত নিযুক্ত শেষ উপাচার্য ছিলেন। আবার অন্যদিকে তিনি ছিলেন ১৯৫১ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের (Calcutta University Act) ভিত্তিতে নিযুক্ত প্রথম উপাচার্য। তবে নতুন আইনে তিনি উপাচার্য হিসাবে বেতন গ্রহণে অধিকারী হলেও বেতন গ্রহণ করেন নি। পূর্বের মত বিনা বেতনে উপাচার্যের কাজ চালিয়েছিলেন। ১৯৫০ সালে বিচারপতি ব্যানার্জী যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছিলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ছিলেন একজন নবাগত ব্যক্তি। এর পূর্বে ছাত্রাবস্থায় ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তাঁর কোন সাক্ষাৎ সংস্রব ছিল না। অনেক দিন আগে তিনি রিপন কলেজে অঙ্কের অধ্যাপনা করেছিলেন। সেই সময়ে শিক্ষা জগতের সাথে তাঁর যোগ থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। অতঃপর তিনি আইন ব্যবসায়ে যোগদান করেন এবং কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন।

১৯৪৯ এবং ১৯৫০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পর্কে নানারকম অভিযোগ সংবাদপত্রে প্রকাশ হচ্ছিল এবং জনমত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে উত্তপ্ত হয়েছিল। ছাত্র ও জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ ও আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল। স্মরণ থাকতে পারে শ্রী চারুচন্দ্র বিশ্বাস কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় আইন মন্ত্রকে নিযুক্ত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদত্যাগ করেন এবং তখন বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপাচার্য নিযুক্ত করা হয়। কাজেই একটা গোলমেলে অবস্থা ও হট্টগোলের মধ্যে তিনি উপাচার্য নিযুক্ত হন। অনেকের ধারণা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তখনকার অবস্থায় একজন বহিরাগত নীতিবান, নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে উপাচার্য পদে নিযুক্ত করলে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অবস্থা ভালর দিকে মোড় ঘুরবে এই বিবেচনা করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সে সময়ে বিচারপতি ব্যানার্জীকে উপাচার্য নিযুক্ত করেছিলেন।

উপাচার্য নিযুক্ত হবার পর বহুবার বহুক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ তাঁকে বলতে শুনেছি যে তিনি সকল বিষয়ে কঠোরভাবে নিয়ম কানুন মেনে চলেন এবং চলবেন। আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে যথা সম্ভব নিয়ম কানুন মেনে চলার পক্ষপাতী ছিলাম। কাজেই তাঁর এই দৃঢ়তায় আমি উৎফুল্লই হয়েছিলাম। কিন্তু বাস্তবজীবনে মানুষকে অনেক সময়ে এমন এক একটা অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় যখন শুধু আইনকে আঁকড়ে থাকা বোধ হয় একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এবং একগুঁয়েমি বলে বিবেচিত হয়। তাই বোধ হয় এরকম অবস্থায় বিচারপতি ব্যানার্জীকে কখনও দৃঢ় হতেও দেখেছি আবার কখনও নমনীয় মনোভাব অবলম্বন করতেও দেখেছি।

এক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরীক্ষায় একটি বিশেষ বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা অধিক সংখ্যায় অকৃতকার্য হচ্ছিল। নিয়ম ছিল যে কোন একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হলে পরীক্ষার্থীদের এক বছর পরে পুনরায় সকল বিষয়ে পরীক্ষা দেবার পর প্রত্যেক বিষয়ে উত্তীর্ণ হলে এবং সামগ্রিকভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যক নম্বর পেলে তবেই তাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে গণ্য করা হবে। একবার ঐ পরীক্ষায় পূর্বোক্ত বিশেষ বিষয়টিতে অনেকজন পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হলেও যেন কয়েকজন মাত্র দুই বা এক নম্বর কম থাকায় অকৃতকার্য হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অলিখিত নিয়ম ছিল অন্য সকল বিষয়ে ভালভাবে পাশ করে কোন পরীক্ষার্থীর একটি মাত্র বিষয়ে পাশের জন্য মাত্র দু এক নম্বর কম থাকলে তাকে ঐ দুই বা এক নম্বর grace mark বা অনুগ্রহান হিসাবে দেওয়া হত। ঐ বছর পরীক্ষার ফল চূড়ান্ত পর্যালোচনা কালে ঐ অলিখিত নিয়মের উল্লেখ করে প্রশ্নোত্তর ছলে ঐ grace mark দেবার প্রস্তাব উত্থাপিত হলে উপাচার্য বললেন, এ নিয়ম কোথায় লেখা আছে দেখান। এটা একটা অলিখিত নিয়ম সে কথার উল্লেখ করা হলে এবং কমিটির অন্য সকল সদস্য এযোগে ঐ প্রকার grace marks দেবার প্রস্তাব সমর্থন করলেও তিনি কিছুতেই লিখিত নিয়মের বহির্ভূত প্রথা মানতে রাজী হলেন না। ফলে সেবার খুব অল্পসংখ্যক পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সে সময়ে তিনি বলেছিলেন যে যদি তাঁর নিজের জন্য ঐ রকম grace marks দেবার প্রয়োজন হয় তা হলেও তিনি তাঁর নিজমতে দৃঢ় থাকবেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে তিনি নিজে নিঃসন্তান ছিলেন।

আরবী এবং ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ও সিণ্ডিকেটের সদস্য মহম্মদ জুবেয়ার সিদ্দিকি উপাচার্যের বিশেষ আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। উপাচার্যের নিয়মকানুন মেনে চলার এই দৃঢ়তার কথা শুনে তিনি বলেছিলেন যে এবথা ঠিক উপাচার্য সব সময়ে নিয়ম-কানুন দৃঢ়তা সহকারে মেনে চলেন। তবে এটাও ঠিক যে একজায়গায় কিন্তু তাঁর ব্যতিক্রম বা কিছু দুর্বলতা আছে। সেটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ক্ষেত্রে। ডাক্তার রায় যা বলবেন সে সম্বন্ধে তাঁর নিজের মত যাই হোক না কেন ডাঃ রায়ের যে মত সেটাই তিনি বিনা দ্বিধায় মেনে নেবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বই কেউ সময়মত ফেরৎ না দিলে বই ফেরৎ না হওয়া পর্যন্ত বই গ্রহণকারীকে তাগিদপত্র দেবার নিয়ম ছিল। কোন রকম ব্যতিক্রম না করে প্রয়োজনে আমি সকলেই পুনঃ পুনঃ তাগিদপত্র প্রেরণ করতাম। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের কাছ থেকে বহুদিন যাবৎ দু তিনখানা বই ফেরৎ না হওয়ায় তাঁর নামে যথারীতি তাগিদপত্র যেত। অবশেষে হয়ত পুনঃ পুনঃ তাগিদপত্র পাওয়ায় তিনি অধীর হয়ে ঐ বইয়ের দাম কত জানতে চাইলেন। তাঁকে দামের কথা জানানো হলে ঐ পরিমাণ টাকার একটা চেক তিনি পাঠিয়ে দেন। যথাসময়ে এবং যথা নিয়মে বিষয়টি লাইব্রেরি কমিটিকে জানানো হলে কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে উপাচার্য লাইব্রেরিয়ানের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে বলেন "এ ব্যক্তি তো সাংঘাতিক লোক। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায়ের কাছ থেকে টাকা আদায় করেছে?" তবে দুঃখের বিষয় নিয়ম মেনে চলার নীতি দৃঢ়ভাবে পালন করার জন্য তাঁর উপরোক্ত উক্তিটি লাইব্রেরিয়ানের প্রশংসাসূচক অথবা মুখ্যমন্ত্রীকে বিরক্ত করার জন্য সেটি বিরক্তিসূচক ছিল সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারা গেল না।

সেনেটের অধিবেশনে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা এবং বিচারপতি মুখোপাধ্যায়ের মত বিখ্যাত ব্যক্তিরা কখনও নিয়ম বহির্ভূতভাবে বক্তৃতা করলে এবং সেদিকে কোন সদস্য উপাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাঁকে একাধিকবার বলতে শোনা গেছে যে আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে তিনি নিয়মবহির্ভূত হলেও ঐ বিষয়ের আলোচনার অনুমতি দিচ্ছেন।

উপাচার্য কোন বিষয়ে কাউকে নিশ্চিত আশ্বাস (assurance) দিয়েছেন এবং কেউ বললে তিনি খুবই বিরক্ত হতেন। তিনি বলতেন assurance তিনি কখনও কাউকে দেন না। এ সত্ত্বেও একবার সেনেটের জনৈক সদস্য পুনরায় ঐ কথা বললে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে ঐ সদস্যকে অভিধান খুলে 'assurance' কথার অর্থটা ভালভাবে দেখার পরামর্শ দেন।

আমরা দেখেছি তিনি খুবই নিয়মনিষ্ঠ এবং পরিশ্রমী ছিলেন। সাধারণতঃ অপরাহ্ণে সাড়ে চারটা নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে প্রয়োজনে রাত্রি প্রায় ৯টা পর্যন্ত থাকতেন। অন্তেও ঐভাবে কর্মময় থাকুন এটাই বোধ হয় তাঁর মনের ইচ্ছে ছিল। এই সূত্রে একবার তাঁর এক কৌতুকজনক মন্তব্যের কথা উল্লেখ করব। এসময়ে পরীক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত পরীক্ষা নিয়ামক (Additional Controller of Examinations) পদত্যাগ করলে ঐ সময়ে সহকারী পরীক্ষা নিয়ামকও (Asst Controller of Examinations) নিজের বিবাহ উপলক্ষে ছুটিতে চলে যান। পরীক্ষা নিয়ামক (Controller of Examinations) প্রশ্নপত্র ছাপার ব্যাপারে সব সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসে থাকেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা বিভাগের মূল কার্যালয়ে কাজের চাপ খুব বৃদ্ধি পায়। উপাচার্য নিজে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিকেল সাড়ে চারটার পরিবর্তে বেলা ১২ টায় এসে রাত্রি ৮টা৯টা পর্যন্ত থাকতেন। তবু কাজের সুরাহা হত না। এরকম অবস্থায় সেনেটের অনুমোদন সাপেক্ষে সিণ্ডিকেট অতিরিক্ত কন্ট্রোলার পদটি পূরণ করেন এবং উক্ত অফিসার কাজে যোগদান করেন। সেনেটের অনুমোদন অথবা সিদ্ধান্তের জন্য সত্বর বিষয়টি সেনেটে পেশ করা হয়। সেনেটের কোন কোন প্রভাবশালী সদস্য এ ভাবে নিয়োগে আপত্তি জানান। তখন উপাচার্য বলেন, কন্ট্রোলারকে মূল কার্যালয়ে পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। অতিরিক্ত কন্ট্রোলার নেই, সহকারী কন্ট্রোলারও ছুটিতে আছেন—এরকম অবস্থায় উপায়ান্তর না থাকায় বাধ্য হয়েই এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। তিনি আরও বলেন সহকারী কন্ট্রোলার তরুণ এবং নতুন লোক, কাজও ভাল করেন। কিন্তু এ সময়ে তাঁর উক্তি—he had no business to marry at this time আমি তাঁকে ছুটি দেবার পক্ষপাতী ছিলাম না। কিন্তু সিণ্ডিকেটের অন্যান্য সদস্য এ বিষয়ে আমার সাথে একমত না হওয়ায় তাঁকে ছুটি দিতে হল।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কোন সময়ে না কোন সময়ে

সংশ্লিষ্ট ছিলেন এরকম দেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি পরলোকগমন করেন বিচারপতি ব্যানার্জী উপাচার্য থাকা কালে। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রথমকার মাইকেল অধ্যাপক ডক্টর ডি, আর, ভাণ্ডারকর, ভারতীয় চারুকলার প্রথম বাগীশ্বরী অধ্যাপক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রী নলিনী রঞ্জন সরকার, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

বিচারপতি ব্যানার্জী দু দফায় মোট তিন বছর রপমাস উপাচার্য পদে আসীন ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে চারবার বার্ষিক কনভোকেশন বা সমাবর্তন উৎসব কখনও বিরাট প্যাণ্ডেল বা মণ্ডপ নির্মাণ করে একদিন অথবা সেনেট হাউসে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। প্যাণ্ডেল খরচ খুব বেশী ছিল। এদিকে কনভোকেশনে উপস্থিতির সংখ্যাও পূর্বাপেক্ষা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। কাজেই ব্যয় সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে শ্রী শম্ভুনাথ ব্যানার্জীর সময়ে সেনেট হাউসে তিনদিনের পরিবর্তে চারদিন ব্যাপী কনভোকেশন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। প্রথম তিনদিন উপাচার্য অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতেন এবং অপেক্ষাকৃত কম মানের অভিজ্ঞান পত্র এবং শেষদিনে উচ্চতম ডিগ্রীর যথা পি, এইচ, ডি, ডি, এস, সি, লিট ইত্যাদির অভিজ্ঞান পত্র প্রদান করা হত ও আচার্য ঐ দিন অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করতেন। তাছাড়া কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে ঐ দিন ভাষণ দিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাভোল ও নানা গোলমাল চলছিল বলে ১৯৫০ সালে বার্ষিক সমাবর্তন হয় নি। তাই ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে ১৯৫০ সালের স্থগিত সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় এবং আবার ঐ সালের ডিসেম্বর মাসে ১৯৫১ সালের বার্ষিক সমাবর্তন হয়। এই উভয় সমাবর্তন সেনেট হাউসে চারদিন ধরে সম্পন্ন হয়েছিল। ১৯৫০ সালের সমাবর্তনে (১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত) বিহারের গভর্ণর ডক্টর এম, এস অ্যানে (Dr. M. S Aney) আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ১৯৫১ সালের কনভোকেশনের চতুর্থ-দিনে ডক্টর মঙ্গলদাস পাকবাস (Dr. Mangaldas Pakvas) আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন। ঠিক স্মরণ নেই যতদূর মনে হয় তিনি বম্বেতে গভর্ণর ছিলেন। বিচারপতি ব্যানার্জীর সময়ে ১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব প্রথম তিনদিন সেনেট হাউসে ও শেষের দিনে বার্ষিক সমাবর্তন ছাড়াও আর একটি বিশেষ সমাবর্তনের আয়োজন করা হয়েছিল। ঐ বিশেষ অধিবেশনে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অসাধারণ কৃতী ছাত্র, ইশান বৃত্তিধারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদকে অনারারি ডক্টর অফ লজ ডিগ্রী দেওয়া হয়। ঐ একই অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বা আচার্য ডক্টর হরেন্দ্র কুমার মুখার্জীকে অনারারি ডক্টর অফ লিটারেচার ও উপাচার্য শ্রী শম্ভুনাথ ব্যানার্জীকে অনারারি ডক্টর অফ লজ ডিগ্রী দেওয়া হয়।

১৯৫৩ সালের বার্ষিক সমাবর্তন ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে সেনেট হাউসে চারদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব গভর্ণর ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু ঐ উৎসবে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন। উপাচার্য চারুচন্দ্র বিশ্বাসের সময়ে আচার্য কর্তৃক নিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট উপাচার্য বিচারপতি ব্যানার্জীর সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিছু কিছু গঠনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তবে সেনেটের অনেক সদস্যের ধারণা ছিল যে অনেক ক্ষেত্রেই রিপোর্ট বিদ্বেষমূলক ছিল। ঐ রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সংশ্রব রহিত করার যে সুপারিশ ছিল সেনেট তা মেনে নিতে পারেন নি। সেনেটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, যেহেতু বিচারপতি মুখার্জী রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটদের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে নির্বাচিত সেই হেতু তাঁকে অপসারণের ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। আবার প্রাক্তন উপাচার্য শ্রী প্রমথনাথ ব্যানার্জী সম্পর্কে অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ কার্যকর

করার অবকাশ নেই বলে সেনেট সিদ্ধান্ত নেন। কারণ একে তিনি আর বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বে নেই। তা ছাড়া তাঁর প্রাপ্য টাকা পয়সার ব্যাপারে এবং ছুটির ব্যাপারের মমাংসা ইতিপূর্বেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় উভয়ের সম্মতিক্রমে হয়ে গিয়েছে। অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কমিটির কোন কোন সুপারিশ কার্যকরী করা হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সুপারিশ মত কাজ হয় নি।

বিচারপতি শম্ভুনাথ ব্যানার্জী উপাচার্য থাকাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠনতন্ত্রগত দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। প্রথমতঃ ১৯৫১ সালের মাধ্যমিক শিক্ষা আইনের বিধানে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড গঠন হয় এবং এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যে প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালিত হত তার পরিবর্তে বোর্ড কর্তৃক ১৯৫২ সাল থেকে মূল ফাইনাল পরীক্ষা পরিচালিত হতে থাকে। এই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ যাবতীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় বোর্ডের অধীনে চলে যায়।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ১৯৫১ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ। এই আইনের ধারামত প্রথম উপাচার্য নিয়োগ ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হলেও ঐ আইনের বিধানমত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কাজ শুরু হতে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাস হয়ে যায়। নতুন আইনের কয়েকটি বৈশিষ্ট উল্লেখযোগ্য। এই আইনে একটি Academic Council এর শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকার বিধান ছিল।

এই আইনে বলা হয়েছে সিণ্ডিকেট উপাচার্য নিয়োগের জন্য তিনটি নাম প্রস্তাব করে আচার্যের কাছে পাঠালে আচার্য তার মধ্যে থেকে একজনকে উপাচার্য হিসাবে নিযুক্ত করবেন। ঐ উপাচার্য বেতনভোগী এবং সর্বসময়ের জন্য কর্মরত উপাচার্য হবেন। এই আইনে দুজন Pro-vice Chancellor নিয়োগের ব্যবস্থাও আছে। এদের একজন শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের (Academic Affairs) ভারপ্রাপ্ত হবেন। অপরজন আর্থিক এবং কর্মপরিচালন (Finance & Business Affairs) সংক্রান্ত বিষয়ের উপাচার্য হিসাবে কাজ করবেন।

এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের জন্য স্বতন্ত্র কোন কক্ষ ছিল না। যাদবভাড়া বিল্ডিং এর দ্বিতলের উত্তর-পশ্চিম কোণের ঘরটি ব্যবহারের জন্য এবং সিণ্ডিকেটের সভার জন্য ব্যবহৃত হত। শ্রী শম্ভুনাথ ব্যানার্জী যাদবভাড়া বিল্ডিং এর দ্বিতলে উত্তর দিককার সিঁড়ির উত্তরে উপাচার্যের জন্য একটি স্বতন্ত্র কক্ষ নির্মাণ করিয়ে নিয়েছিলেন। অদ্যবধি সেই কক্ষই উপাচার্যের কক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এ কথা সকলেরই জানা আছে যে কল্যাণী নগর তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের মানস কন্যা ছিল। তখনও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হয় নি। আমরা শুনতাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কল্যাণীতে সরিয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল ডাক্তার রায়ের। কথাটার মূলে কতটা সত্য ছিল জানি না। তবে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে একান্ত স্থানাভাবের জন্য স্থান সঙ্কুলানের জন্য উপাচার্য শ্রী ব্যানার্জীকে আমরা যখনই তাগিদ দিতাম তখনই বলতেন "অপেক্ষা করুন, আমি সব কল্যাণীতে নিয়ে যাব"।

পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারারের পদ ছাড়া Assistant Lecturer-এর পদও ছিল। বিচারপতি ব্যানার্জীর সময়ে (১৯৫১ সালে) লেকচারারের এবং অ্যাসিষ্টাণ্ট লেকচারারের পার্থক্য ঘুচিয়ে সকলকেই লেকচারার শ্রেণীভুক্ত করা হয় এবং Assistant lecturer এর পদ তুলে দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হোষ্টেল এবং মেসের একজন পরিদর্শকের পদ (Inspector of Hostels and Meses) ছিল। এঁর সময়ে ঐ পদ তুলে দেওয়া হয়। অনেক ইন্সপেক্টর অফ হোষ্টেলস এণ্ড মেসেস এর কার্যকালে তাঁর সম্বন্ধে নানারকম চাঞ্চল্যকর খবর শোনা যেত। পরে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক অফিসারের পদ লাভ করেন। সেখানেও তাঁর চাঞ্চল্যকর কুকীর্তির কথা আদালতে ওঠে এবং তাঁর হওয়াদেশ হয়।

শ্রী শম্ভুনাথ ব্যানার্জী উপাচার্য থাকাকালে পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবার অনতিকাল মধ্যে পরীক্ষার্থীদের কাছে তাদের মার্কশীট সরবরাহ করার এক ব্যবস্থা করা হয়। ইতিপূর্বে পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরেই বাধ্যতামূলকভাবে সকলকে 'মার্কশীট' সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল না। যারা মার্কশীট নিতে ইচ্ছুক তাদের পক্ষেও তা পেতে দেরী হত।

পূর্ববর্তী পর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা এক অধ্যাপক তাঁর এক ছাত্রীকে আপত্তিজনক চিঠি লেখায় তাই নিয়ে শ্রী চারুচন্দ্র বিশ্বাস উপাচার্য থাকাকালে সেনেটে হৈচৈ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই সম্পর্কে সেনেট থেকে তিরস্কারসূচক প্রস্তাব গ্রহণের কথাও ঐ পর্বে উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে এই ব্যাপার নিয়ে পরে আরও জল ঘোলা হয়েছিল। সেই সূত্রে এখানে বলা যেতে পারে শ্রী শম্ভুনাথ ব্যানার্জীর কার্যকাল উক্ত অধ্যাপকদের ৬৭ বছর বয়সের সময়ে তাঁর প্রথম দফার কার্যকালের মেয়াদ শেষ হলে তাঁর ৬০ বছর বয়স পূর্তি পর্যন্ত কার্যকাল বৃদ্ধির প্রস্তাব উত্থাপিত হলে সেনেটে প্রচণ্ড বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়। অল্প ভোটের ব্যবধানে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হলেও সেনেটের এক শক্তিশালী সদস্য ও ভূতপূর্ব উপাচার্য শ্রী চারুচন্দ্র বিশ্বাস ঐ গৃহীত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নানা যুক্তি দেখিয়ে এক তীব্র প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করেন। উপাচার্য শ্রী ব্যানার্জীর অভিপ্রায় অনুসারে সেনেটের অপর এক শক্তিশালী সদস্য অধ্যাপক শ্রীকুমার ব্যানার্জী এবং আরও দুজন সদস্য যুক্তভাবে শ্রী চারুচন্দ্র বিশ্বাসের যুক্তি সমূহ খণ্ডন করে একটি প্রত্যুত্তর প্রস্তুত করেন। এ সমস্তই বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে।

১৯৪১ সালের মার্চ মাসে রেজিষ্ট্রার শ্রী সতীশ চন্দ্র ঘোষের বয়স ৬০ বছর পূর্ণ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে আর তাঁকে ঐ পদে রাখা সম্ভব না হওয়ায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে রাখা প্রয়োজনবোধে একটি Special Officer-এর পদ সৃষ্টি করে সেই পদে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন আইনে ট্রেজারারের পদ সৃষ্টি হওয়ায় এবং সে পদে বয়সের সীমা নির্ধারিত না থাকায় অতঃপর তাঁকে সেই পদে নিযুক্ত করা হয়। সতীশবাবুর পরে রেজিষ্ট্রারের পদে পশ্চিমবঙ্গের অবসর প্রাপ্ত ডাইরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশান ডক্টর মেহেমর দত্ত নিযুক্ত হন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে এর পরে নতুন আইনে যে সকল রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন তাঁদের বিধিগতভাবে আর পূর্বের মত ক্ষমতা ছিল না। কারণ নতুন আইনে উপাচার্য সর্বসময়ের জন্য বেতনভোগী পদাধিকারী ছিলেন। তাছাড়া দুজন প্রো-ভাইসচ্যান্সেলর এবং একজন ট্রেজারার নিয়োগের ব্যবস্থাও ছিল ছিল নতুন আইনে।

আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে উপাচার্য শ্রী শম্ভুনাথ ব্যানার্জীর সময়ের কথার পর্ব শেষ করব। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বোধহয় ১৯১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। পরে ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টির পরে সেখানে চলে যান। পুনরায় ১৯৪০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। ১৯৫৩ সালে পদার্থ বিদ্যার খয়রা অধ্যাপক হিসাবে তাঁর অবসর গ্রহণের প্রশ্ন উঠলে তাঁর প্রকৃত বয়সের প্রশ্ন নিয়ে সেনেটে খুবই বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক বসুর পিতার এক এফিডেবিট অনুসারে তাঁর ষাট বছর বয়স পূর্ণ হবার কথা ১৯৫৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঐ এফিডেভিট স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ১৯৪৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার সময়ে অধ্যাপক বসু ঐ এফিডেভিট মত বয়সের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তার ফলে ৬০ বছর বয়স ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ৩১শে মার্চ। অর্থাৎ এফিডেভিট করা বয়স অপেক্ষা ৯ মাস পূর্বে।

তাঁর কোন জন্ম তারিখকে যথার্থ জন্মতারিখ হিসাবে গণ্য করা হবে তাই নিয়ে তখন সেনেটের একাধিক

অধিবেশনে অনেক বাদানুবাদ হয়। একদল মত প্রকাশ করেন ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটের বয়সই বিশ্ববিদ্যালয় যথার্থ বয়স বলে গ্রহণ করে থাকেন ; বিশ্ববিদ্যালয়ের এটাই রীতি। অপর দলের অভিমত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন এফিডেভিটের বয়সকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং ১৯৪০ সালে যখন অধ্যাপক বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন তখন ঐ এফিডেভিটের বয়সই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তখন থেকে এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় যে সেটি স্বীকার করে নেন নি সে কথা যখন তাঁকে জানানো হয় নি তখন এফিডেভিটের বয়সটাই স্বীকার করে নেওয়া উচিৎ। ৬০ বছর বয়স পূর্ণ হবার পর কার্যকাল আরও এক বছর বৃদ্ধি হবার প্রস্তাব ছিল। প্রথম দলের মতে ঐ বৃদ্ধির কার্যকালের শেষ হবার কথা ১৯৪৯ সালের ৩১শে মার্চ। আর দ্বিতীয় দলের মতে ১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। ব্যক্তিগত ভাবে সেনেটের কোন সদস্যেরই অবশ্য এটা অনভিপ্রেত ছিল না যে অধ্যাপক বসুর মত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযোগের কাল সংক্ষেপ হোক। কিন্তু নীতির প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। অবশেষে সকল কচকচির অবসান হল যখন সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে তাঁর কর্মকাল ১৯৪৩ সালের ১লা এপ্রিল থেকে এক বৎসরে পরিবর্তে দু বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করা হবে অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ ঐ কার্য কাল শেষ হবে। তার ফলে দ্বিতীয় দলের মতানুসারে যে পর্যন্ত তাঁর কার্যকাল বৃদ্ধি হবার কথা সেই কার্যকাল তার চাইতে আরও ৩ মাস দীর্ঘতর হবে। এই ব্যবস্থায় সকলেই সন্তুষ্ট হলেন এবং 'সব ভাল যার শেষ ভাল' এই নীতি বাক্যের সার্থক রূপায়ণ হল।

সাহিত্যিকা ৬.১০.৮৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আবেদন

গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন

আগামী ২০ ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস। অন্যান্য বারের মত এবারও নিজ নিজ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন। গ্রন্থাগারের পরিচ্ছন্নতা বিধান, জনসংযোগ বৃদ্ধি, সভা-সমিতি প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রন্থাগার দিবসের কর্মসূচী গ্রহণ করুন।

অরুণ রায়
কর্মসচিব

সূচীকরণ সংহিতা ঃ নীতি ও সমীক্ষা

পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায়

আগের রচনায় (সূচীকরণ সংহিতা : উপাদান ও সমীক্ষা ; ভাদ্র, ১৩৯৫ ; পৃ : ১২৫) উল্লেখ করেছি যে, সূচীকরণ সংহিতার উপাদান হিসাবে নীতি সমূহ (Principles) এবং বিধিসমূহ (Rules) থাকা দরকার।

সূচীকরণের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই মৌলিক নীতিগুলি রচনা করতে হবে এবং ঐ নীতিগুলির ভিত্তিতে যুগোপযোগী বিধিগুলি প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নীতি ও বিধিগুলির দৃষ্টান্ত সহ ব্যাখ্যা থাকা দরকার।

বিভিন্ন স্তরের সংহিতার প্রত্যেকের জন্যই নির্দিষ্ট নীতি এবং বিধি থাকবে। আবার কোন কোন নীতি একাধিক স্তরের বা সবকটি স্তরের উপযোগী হতে পারে, সেই নীতি গুলি আমরা মৌলিক নীতি বলতে পারি। একটি মৌলিক নীতি একটি নির্দিষ্ট স্তরের জন্য হতে পারে এবং সেই নীতি থেকে অন্যান্য বিশেষ নীতিগুলি রচনা করা যেতে পারে। আবার, একটি মৌলিক নীতি সবকটি স্তরের উপযোগী হতে পারে। তবে সামগ্রিকভাবে সবকটি নীতি —মৌলিক এবং বিশেষ নীতি একে অন্যের বিরোধিতা শূন্য পরস্পরের পরিপূরক হবে এবং সজীব নীতি ব্যবস্থার রূপ প্রকাশ করবে।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, নীতি এবং বিধি বলে আমরা কি বুঝি? অনেক সময়েই এই দুটি শব্দের ব্যবহার একই ভাব প্রকাশ করে থাকে। আমাদের প্রয়োজন সূচীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে শব্দ গুলির অর্থ নির্দিষ্ট করা। না হলে প্রয়োগের এবং বোঝার সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। অধিকন্তু, যে হেতু সূচীকরণের ব্যবহারিক দিকই প্রধান, সে জন্য এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দগুলির মানে স্বতন্ত্রীকরণের প্রয়োজন, না হলে, একই শব্দ বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহৃত হয়ে এবং ভিন্ন শব্দ একই মানে প্রকাশ করে সংশয় সৃষ্টি করবে।

নীতি : নীতি বলতে আমরা বুঝি যে, একটি মৌলিক সূত্রের সংকেত ব্যক্ত করার জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কতকগুলি উক্তি বা প্রতিজ্ঞা।

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উক্তিগুলি নীচে বলা হল :—

১) নীতি একটি সত্য, মৌলিক—ঘটনা, তথ্য, বিষয় কাজ, ইত্যাদির বিবরণ, বিবৃতি হতে পারে ;

২) এগুলি শাশ্বত সত্য হতে পারে (সার্বজনীন ও সর্বকালীন সত্য) ;

৩) এগুলি উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করতে পারে ;

৪) এগুলি থেকে সমগুণ সম্পন্ন অন্য একটি সত্য, মৌলিক ঘটনা, বিষয়, তথ্য, কাজ, ইত্যাদির জন্ম বা উদ্ভব হতে পারে, বা এগুলি অন্য কোন সত্য, মৌলিক ঘটনা, তথ্য বিষয়, কাজ, ইত্যাদির উপাদান হতে পারে ;

৫) এগুলি যুক্তিনিষ্ঠ বিচারের অথবা মূল্যায়নের ভিত্তি হতে পারে ;

৬) এগুলি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সাধারণ পদক্ষেপ গুলির নির্দেশিকা হিসাবে গণ্য হতে পারবে।

সাধারণতঃ উপরে লেখা উক্তিগুলির মধ্যে যে কোন একটি 'নীতি' অথবা একাধিক উক্তির সমন্বয়ে গঠিত 'প্রস্তাব'-কে নীতি বলে ধরা যেতে পারে।

বিধি : এবার বিধি বলতে আমরা বুঝি যে, নীতি-বা নীতিগুলির ভিত্তিতে প্রণীত সূচীকরণ প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত করার (যেমন, তথ্য মৌল নির্বাচন, রূপ নির্ধারণ ও লিপিবদ্ধকরণ) নির্দেশগুলিকে। নীতি হচ্ছে নির্দেশাত্মক ভিত্তি আর বিধি হচ্ছে নীতিকে বাস্তবায়িত করার নিয়ম সমূহ।

দৃষ্টান্ত : এবার 'নীতি ও বিধি'—গুলির প্রাসঙ্গিক রূপায়ণ করার জন্য সূচীকরণ প্রক্রিয়ার কয়েকটি দৃষ্টান্ত

নিয়ে আলোচনা করা যাক। নীচে লেখা উক্তিগুলি ক্রম পর্যায়ে আলোচনা করলে বিষয়টি আরো সহজে বোঝা যাবে :

১) বই ব্যবহারের জন্য (গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূল সূত্র) ;

২) সূচীকরণ বইয়ের ব্যবহার বাড়ায় (সূচীকরণের মূল নীতি) ;

৩) সূচীতে বাঞ্ছিত শিরোনামের প্রয়োগ (Sought heading) বইটির ব্যবহারের অধিকতর সুযোগ করে দেয় (সূচীকরণের ক্ষেত্রীয় নীতি) ;

৪) সাধারণতঃ বাঞ্ছিত শিরোনাম বইটির আখ্যা পত্রে (Title page) বর্ণীত তথ্যের ভিত্তিতেই নির্ণয় করা হয় (সূচীকরণের ক্ষেত্রীয় নীতি) ;

৫) নির্বাচিত শিরোনাম হিসাবে লেখকের নামের রূপ নির্ধারণের (Rendering) জন্য নামের উপাদানগুলি নীচে ক্রমানুসারে সাজানো হয় (বিধি) :

(ক) সংলেখের মুখ্য উপাদান সমূহ (Entry elements) ;

খ) সংলেখের গৌণ উপাদান সমূহ (Secondary elements) ;

গ) স্বতন্ত্রীকরণের উপাদান সমূহ (Iodvidualizing elements) ।

৬) এবার, একজন ইউরোপীয় লেখকের নামের উপাদানগুলি যে ক্রমে সাজানো হয়, তা হল :

ক) মুখ্য উপাদান হিসাবে লেখকের বংশগতনাম (Family name) ;

খ) গৌণ উপাদান হিসাবে লেখকের নামের বাকি অংশ ;

গ) স্বতন্ত্রীকরণের উপাদান হিসাবে লেখকের জন্ম তারিখ।

কিন্তু একজন বাঙালী লেখকের লেখা বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে উপাদানগুলি যে পর্যায়ে সাজানো হয়, তাহল :

ক) ব্যক্তিগত নাম (পদান্ত বা মধ্যবর্তীনাম সহ) ;

খ) বংশগত নাম ;

গ) জন্ম তারিখ।

৭) রোমান লিপিতে নীচে লেখা পদ্ধতিতে লেখকের নাম লিপিবদ্ধ করা (Recording) হয় :

ক) কার্ডপ্রথার সূচীতে প্রথম লাল সমান্তরাল রেখার উপর এবং বাঁধিকের প্রথম লাল লম্বরেখার পর থেকে শুরু করা হয়। প্রথম শব্দটি বা শব্দগুলি (যুগ্মনামের ক্ষেত্রে) বড় হাতের অক্ষরে লেখা হয়।

খ) বংশগত নাম লেখার পর একটি কমা (,) ব্যবহার করা হয় এবং তারপর নামের বাকি অংশ লেখা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি শব্দের প্রথম অক্ষরটি বড় হাতের এবং বাকি অক্ষরগুলি ছোট হাতের লেখা হয়।

গ) ব্যক্তিগত নাম লেখার পর একটি কমা (,) ব্যবহার করে লেখকের জন্ম তারিখ আরবীয় সংখ্যায় লেখা হয়।

ঘ) সবশেষে একটি পূর্ণচ্ছেদ বা ফুলষ্টপ (.) ব্যবহার করা হয়। যেমন,

EVANS, Dorothy Barbara, 1897.

বাঙালী লেখকের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি নেয়া হয় তাহল :

ক) বাঁধিকের প্রথম লাল লম্বরেখা থেকে শুরু করে এবং প্রথম লাল সমান্তরাল রেখার উপর লেখা হয়। এক্ষেত্রে বড় হাতের বা ছোট হাতের অক্ষরের কোন সমস্যা নেই।

খ) ব্যক্তিগত নাম (পদান্ত বা মধ্যবর্তীনামসহ) লেখার পর একটু জায়গা ছেড়ে বংশগত নাম লেখা হয়।

গ) বংশগত নাম লেখার পর একটি কমা (,) ব্যবহার করে লেখকের জন্ম তারিখ বাংলা সংখ্যায় লেখা হয়।

ঘ) পরিশেষে একটি পূর্ণচ্ছেদ বা দাড়ি (।) ব্যবহার করা হয়। যেমন,

বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ১৮৯৩।

বিশ্লেষণ : ১) গ্রন্থাগার পরিষেবার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম উক্তিটি—"বই ব্যবহারের জন্য"—এটিকে মূল

উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করলে গ্রন্থাগারের সমস্ত পদক্ষেপ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুবিধা হয় এবং এই উদ্দেশ্যকেই চরিতার্থ করার উপযোগী সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা হয়। আবার সিদ্ধান্তগুলি সঠিক বা উপযুক্ত কিনা তার মূল্যায়ন সূচীর মূল উদ্দেশ্যগুলি কতটা চরিতার্থ হচ্ছে বা কতটা বই ব্যবহৃত হচ্ছে—তার ভিত্তিতে করা যায়। সুতরাং ১নং উক্তিটিকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূল নীতি হিসাবে চিহ্নিত করা যায় এবং এই উক্তিটি গ্রন্থাগার পরিষেবার ক্ষেত্রে সার্বজনীন ও সর্বকালীন সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২) মূল উদ্দেশ্য 'বই ব্যবহারের জন্য' চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়, তার মধ্যে সূচীকরণ অন্যতম। সুতরাং ১নং উক্তি সূচীকরণের ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করছে। আবার, সূচীর উদ্দেশ্য কি হবে সেটাও বলে দিচ্ছে, যেমন সূচীকরণ 'বইয়ের ব্যবহার বাড়ায়' যেটা ১ নং উক্তি থেকে উদ্ভূত আর একটা নীতি। আবার সঠিক সূচীকরণের মূল্যায়ন ১নং উক্তি কতটা পূরণ করা যাচ্ছে তার উপর নির্ভর করছে। সুতরাং বলা যায় যে, ১নং উক্তি একটা মৌলিক নীতি এবং ২নং উক্তি মূলত নীতি এবং সূচীকরণের প্রধান নীতি।

৩) আবার, ৩নং উক্তি—"সূচীতে বাঞ্ছিত শিরোনামের প্রয়োগ বইটির ব্যবহারের অধিকতর সুযোগ করে দেয়"—এটি কার্যত ২নং উক্তি চরিতার্থ করার জন্য অন্য একটা নীতি। যেটা সূচীকরণের ক্ষেত্রীয় নীতি। যেটা সূচীকরণের ক্ষেত্রীয় নীতি হিসাবে ধরা যেতে পারে।

৪)। আবার, ৪ নং উক্তি—"সাধারণতঃ বাঞ্ছিত শিরোনাম বইটির আখ্যাপত্রে বর্ণীত তথ্যের ভিত্তিতেই নির্ণয় করা হয়"—এর মাধ্যমে পাঠক তার বাঞ্ছিত বইটি সহজেই পেয়ে যান। কারণ তার জানা বইয়ের খোঁজে বইয়ের আখ্যাপত্রে মুদ্রিত লেখকের নাম বা আখ্যা উল্লেখ করে পাঠক সূচী ব্যবহার করে এবং তার সেই আবেদন সূচীতে লিখিত বাঞ্ছিত শিরোনামের দ্বারা সহজেই চরিতার্থ করা যায়। পাঠকের আবেদন ও সূচীতে লিখিত শিরোনাম সহজেই মিলে যায়। যার ফলে বইয়ের ব্যবহার বেড়ে যায়। সুতরাং এটি সূচীকরণের ক্ষেত্রীয় নীতি।

৫) এবার বলা যেতে পারে, ১নং উক্তি থেকে ২নং, ২নং থেকে ৩নং এবং ৩নং থেকে ৪নং উক্তি উদ্ভূত। ১নং উক্তিটি ২নং এর, ২নং উক্তিটি ৩নং এর এবং ৩নং উক্তিটি ৪নং—উক্তিগুলির মূল্যায়ণের ভিত্তি হিসাবে ধরা যেতে পারে। সুতরাং ১নং উক্তিটি মৌলিক নীতি, ২নং থেকে ৪নং ক্ষেত্রীয় নীতি যা ১নং থেকে উদ্ভূত। এই নীতিগুলি সূচীকরণের বিভিন্ন স্তরের উপযোগী নীতি এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হল যে, কোন উক্তিই কিন্তু ব্যবহারিক সূচীকরণের (Practical Cataloguing) উল্লেখ করছে না।

৬) আবার ৫নং উক্তি থেকে ৮নং উক্তিগুলির প্রত্যেকটিই ব্যবহারিক সূচীকরণের (Rules of Procedure) উল্লেখ করছে। সুতরাং উক্তিগুলিকে আমরা 'বিধি' (Rules) বলে চিহ্নিত করতে পারি।

৭) আবার, ৫নং উক্তি সাধারণ ভাবে লেখকের নামের রূপনির্ধারণের নির্দেশ দিচ্ছে এবং ৬নং উক্তি নির্দিষ্টভাবে ইউরোপীয় বা বাঙালী লেখকের নামের রূপ নির্ধারণের নির্দেশ দিচ্ছে। সুতরাং বলা যেতে পারে, ৫নং এবং ৬নং উক্তি কখনই নীতি নয়, বরঞ্চ এগুলিকে বিধি সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম (General Rule) বলতে পারি।

৮) পরিশেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, ১নং হইতে ৪নং উক্তিগুলি 'নীতি'র অন্তর্ভুক্ত এবং ৫নং হইতে ৮নং উক্তিগুলি 'বিধি'র অন্তর্ভুক্ত। নীতিগুলির উপর ভিত্তি করেই ব্যবহারিক সূচীকরণ (নির্বাচন, রূপনির্ধারণ ও লিপিবদ্ধকরণ) সম্পর্কে নির্দেশগুলি প্রণীত।

সমীক্ষা : এখন সমীক্ষা করে দেখা যাক যে প্রচলিত বা জনপ্রিয় সূচীকরণ সংহিতাগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে কি কি নীতি এবং বিধির উল্লেখ আছে। আজকের

দিনে সর্বাধিক প্রচলিত দুটি সূচীকরণ সংহিতা (অভিধানিক ও বর্গভিত্তিক)—ইঙ্গ আমেরিকান ক্যাটালগিং রুলস (২য় সং, ১৯৭৮) এবং রঙ্গনাথন প্রণীত ক্লাসিফায়েড ক্যাটালগিং কোড (৪র্থ সং, ১৯৬৪) আলোচনা করলেই শাস্ত্রিক চিত্র পরিষ্কার হয়ে যায়। তবে ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে নীচের সবগুলি সূচীকরণ সংহিতার আলোচনা করা দরকার, যদিও খুব সংক্ষেপেই তা করা হচ্ছে। সংহিতাগুলি হল :

ক) ব্রিটিশ মিউজিয়াম ক্যাটালগিং রুলস্ ; (১৯৩৪ ।

খ) রুলস্ ফর ডিক্‌শনারী ক্যাটালগ (কাটার) ; (১৯০৪) ।

গ) এ,এ কোড (১৯০৮)।

ঘ) প্রাশিয়ান ইনস্ট্রাকশন ;

ঙ) ভ্যাটিকান কোড ;

চ) আমেরিকান লাইব্রেরী এ্যাসোশিয়েশন ক্যাটালগিং রুলস্ (১৯৪৯)।

ছ) এ্যাংলো-আমেরিকান ক্যাটালগিং রুলস্ (১ম সং, ১৯৬৭)।

জ) এ্যাংলো-আমেরিকান ক্যাটালগিং রুলস্ (২য় সং, ১৯৭৮)।

ঝ) ক্লাসিফায়েড ক্যাটালগ কোড (রঙ্গনাথন (৪র্থ সং, ১৯৬৪)।

আধুনিক সূচীকরণ সংহিতার জনক হিসাবে ব্রিটিশ মিউজিয়াম কোড যদিও সুস্পষ্ট ভাষায় 'নীতি' বলে কিছু উল্লেখ করেনি, তবে বিভিন্ন বিধির মাধ্যমে নানা নীতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ হিসাবে সূচীর সংগ্রহ তালিকা সংক্রান্ত ভূমিকা এবং আখ্যাপত্রে বর্ণীত তথ্যের ভিত্তিতে সূচী প্রস্তুত করা। পরবর্তীকালে কাটার সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট ভাষায় 'রুলস্ ফর ডিক্‌শনারী ক্যাটালগ' এ সূচীর উদ্দেশ্য বিশদভাবে বর্ণনা করেন ও ব্যাখ্যা করেন এবং সূচী প্রস্তুত করার নীতি হিসাবে (১) পাঠকের ব্যক্তিগত রুচি এবং সুবিধাকে গুরুত্ব দেবার কথা, (২) নির্দিষ্ট ও সংগতিপূর্ণ, অবিচল বিষয় লেখ প্রস্তুত করার কথা, এবং (৩) সূচীকে সংগ্রহ তালিকা সংক্রান্ত ভূমিকা পালনের উর্ধে প্রতিষ্ঠিত করার কথা, উল্লেখ করেন। কাটার বর্ণীত সূচীর উদ্দেশ্য আজও ব্যাপকভাবে সমাদৃত। সে হিসাবে এটা যুগান্তকারী ঘটনা। তাঁর বর্ণীত 'পাঠকের ব্যক্তিগত রুচি এবং সুবিধাকে গুরুত্ব দেবার কথা, আজকের দিনেও কম্পিউটার সূচীর ক্ষেত্রেও সমাদৃত (users'cordial)। এ, এ, কোড কাটার বর্ণীত নীতি এবং উদ্দেশ্য গ্রহণ করেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় গুরুত্ব প্রাধান্য পেয়েছে এবং প্রচলিত সূচীকরণ পদ্ধতির মধ্যে সমতা আনা ও সমন্বয় সূচী প্রস্তুত করার লক্ষ্য পূরণের কথা বলা হয়েছে। কোন সংহিতাই কিন্তু সুস্পষ্ট ভাষায় নীতি সমূহ উল্লেখ করে নি, যদিও বিধিগুলির মাধ্যমে নীতিগুলির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় ।

এ. এ. সি. আর (১ম সং ১৯৬৭) তে যদিও সাধারণ নীতি হিসাবে চারটি নির্দেশ দেয়া আছে, সেগুলিকে খুব সংকীর্ণভাবে গ্রহণ করলে নীতি বলতে পারি, কিন্তু আলোচিত সংজ্ঞা অনুযায়ী সেগুলি কখনই নীতির পর্যায়ে পড়ে না, বরঞ্চ সেগুলিকে 'সাধারণ বিধি নির্দেশ' বলা যেতে পারে ।

এ. এ. সি. আর (২য় সং ১৯৭৮) তে যদিও প্রথম সংস্করণের নীতিগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং মূলত ১৯৬১ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত সূচীকরণের নীতি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের (ICCP, 1961) গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি আরো ব্যাপক এবং বিশদভাবে প্রয়োগের কথা স্বীকার করা হয়েছে ।

এখন বলা যেতে পারে যে, সর্বপ্রথম কাটারই সুস্পষ্ট ভাষায় সূচীকরণের নীতি এবং উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেন। অন্যান্য সংহিতাগুলিতে বিভিন্ন বিধির মাধ্যমে বিভিন্ন নীতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেলেও কোন সংহিতাতেই সুস্পষ্ট ভাষায় নীতির উল্লেখ নেই। কাটারের পরবর্তীকালে তাঁর নীতি এবং উদ্দেশ্যকে উন্নত করার প্রচেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তা তাৎক্ষণিক এবং মূলত কোন তথ্য

বা তথ্য হাজির করেনি, বরঞ্চ কাটারের কথাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হয়েছে।

রঙ্গনাথনই ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত তাঁর পুস্তক 'Theory of catatogue' এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট ভাষায় সূচীকরণের নীতি গুলিকে উল্লেখ করেন এবং দৃষ্টান্ত সহ ব্যাখ্যা দেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সূচীকরণ সংহিতা-গুলির তুলনামূলক আলোচনার সঙ্গে (Heading and canons, 1955) নীতিগুলির পরিবর্ধন, পরিমার্জন এবং সংযোজন করেন। পরবর্তীকালে আবার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নূতন নীতি ১৯৬৯ সালে সংযোজন করেন (Canon of Recall Value)।

পরবর্তী পর্যায়ে রঙ্গনাথন প্রণীত সূচীকরণের নীতিগুলি আলোচনার চেষ্টা করবো।

সহায়ক গ্রন্থাদি :

1. Ranganathan, S.R.—Heading and Canons. 1955.

2 Bhattacharyya, G —Standardization of Bibliographic Description : Principles and Practice. 1979. D.1—5.

3. বিমলকান্তি সেন সত্যব্রত রায় এবং অশোক পোদ্দার—গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ : ইংরেজী- -বাংলা', ১৯৮৮।

শোকসংবাদ

- মেদিনীপুর জেলার 'যুগচেতনা' গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক সুভাষ প্রধানের হৃদরোগে জীবনাবসান হয়েছে।
- বাঁকুড়া 'উদয়ন সঙ্ঘ পাবলিক লাইব্রেরী'র সাইকেল পিওন অনাথবন্ধু অধিকারী গত ৩১ আগষ্ট তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।
- এছাড়া সম্প্রতি জলপাইগুড়ির অরুণ রাহা ও মুর্শিদাবাদের জেলা গ্রন্থাগারিক ক্ষীরোদ সরখেলের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গেছে। পরিষদ এঁদের আত্মীয় পরিজনকে সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

Annals of Library Literature, Vol. 1, 1987 (Annual). Published by Asok Basu for the Department of Library & Information Science, Vidyasagar University, Medinipur, 721101, Managing Editor ; Satyananda Mandal ; P 130, Rs. 40/-

আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো বলবেন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের তো অনেক পত্র-পত্রিকাই রয়েছে আবার একটা নতুন পত্রিকা কেন ? প্রচলিত পত্রিকা গুলিই যখন লেখার অভাব, গ্রাহকের অভাব, অর্থের অভাব, সুপরিচালনার অভাবে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে না. সুনির্দিষ্ট মান বজায় রাখতেও পারছে না তখন আবার নতুন একটি পত্রিকা প্রকাশ করে সেটা কি চালানো যাবে ?

আমাদের দেশে বর্তমানে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পত্রিকার সংখ্যা বড় জোর বিশের কাছাকাছি হতে পারে। এত বড় একটা দেশের পক্ষে এই সংখ্যাকে খুব বেশী বলা যায় না। যদিও ভারতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বই এবং পত্র পত্রিকা পঞ্চাশ বছরেরও অধিক কাল ধরে প্রকাশিত হচ্ছে কিন্তু উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে সে পরিমাণে কম। এই সকল বই এবং পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধাদির লেখকের সংখ্যাও সীমাবদ্ধ। এ পর্যন্ত যত পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে অল্পকিছু সংখ্যকই দীর্ঘকাল ধরে টিঁকে আছে ; আবার কম সংখ্যকই উচ্চমানের এবং নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

মনে হয়, যে সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই সকল পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁরা অনেক সময় অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই পত্রিকা প্রকাশ করতে চান নানারূপ সমস্যা দেখা দেয়। তাই যখনই কোন নতুন পত্রিকা প্রকাশ করার কথা আমরা চিন্তা করব আমাদের ভেবে দেখতে হবে, এই নতুন পত্রিকাটি কোন প্রয়োজন মিটাবে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোন বিশেষ ক্ষেত্র বা সাধারণ ভাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সব বিষয়গুলি নিয়ে হবে এই পত্রিকা।

এ পর্যন্ত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের যে সকল পত্রিকা আমাদের দেশে প্রকাশিত হয়েছে তার বেশির ভাগই সাধারণত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সকল বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ প্রকাশ করে কেবলমাত্র দুয়েকটি পত্রিকা আছে যাতে বিশেষ বিষয়ের ওপর নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ 'ইনফ্লিব্ক'ও 'দারঙ্গা-রঙ্গনাথন এনবি-র পত্রিকা এবং 'ইয়াসলিক বুলেটিনের' নাম করা যায়।

কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় পত্রিকার পক্ষে অবশ্য কর্তৃপক্ষের আনুকূল্য এবং উৎসাহ পেলে এত কিছু ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন হয় না। কেননা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টির পঠন-পাঠন, গবেষণা ইত্যাদির উৎকর্ষ সাধনের জন্যই পত্রিকার প্রকাশ প্রয়োজন। সেখানে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্র-গবেষক এবং আরও অনেকে যাঁরা ঐ বিষয়ের চর্চা করেন তাঁরাই হবেন এর লেখক সমাজ। ফ্যাকাল্টির উৎসাহী সদস্যগণ হবেন এর পরিচালক মণ্ডলী। এই পরিচালকমণ্ডলীতে ছাত্রদের রাখলেও অনেক কাজ হবে তাঁদের দিয়ে। বিভাগীয় পত্রিকা প্রকাশের জন্য সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ইউ জি সি থেকে অর্থ বরাদ্দও পেয়ে থাকেন।

ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের পত্রিকা সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয় 'Libra' রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ সালে। ১৯৬৪ সালে কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয় (ধারওয়াড়) থেকে 'Timeless Fellowship' প্রকাশ হতে শুরু করে। ১৯৬৭ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ থেকে 'Librarian' প্রকাশিত হয়। মাত্র দুটি সংখ্যা প্রকাশের পরই এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৮৪ সালে আবার নতুন করে পত্রিকাটির প্রকাশ হতে শুরু করে, কিন্তু দুটি সংখ্যা প্রকাশের পর এবার পত্রিকাটির তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৮০ সাল থেকে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Journal of Library and Information Science' প্রকাশিত হচ্ছে। এই হিসেবে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় পত্রিকাটি সম্ভবতঃ সর্ব কনিষ্ঠ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগটির বয়সও মাত্র দুই কি তিন বছর।

আলোচ্য পত্রিকাটির এই সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধটি লিখেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রথম উপাচার্য শ্রী বি লি মুখার্জী। তাঁর প্রবন্ধের নাম 'গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান—এক অপেশাদারের ভাবনা।' প্রবন্ধটি ইংরাজীতে লিখিত। উপাচার্য মহাশয় অপেশাদার হলেও পণ্ডিত লোক এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী তো বটেন। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত গ্রন্থাগারের বিবর্তনের ইতিহাস তিনি যেমন জানেন তেমনি আধুনিক গ্রন্থাগারের পরিষেবা সম্বন্ধেও তিনি যে বেশ ওয়াকিবহাল একথা তাঁর প্রবন্ধ পড়ে মনে হল।

উপরে বর্ণিত প্রবন্ধটি নিয়ে পত্রিকাটিতে সর্বমোট বারোটি প্রবন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে দশটি ইংরাজীতে লিখিত এবং দুটি বাংলায়। আবার এর মধ্যে ছটি এসেছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ থেকে যাদবপুর দুটি, কলিকাতা একটি, রবীন্দ্র ভারতী একটি, মেদিনীপুর একটি এবং অন্ধ্র একটি। খড়্গপুর আই আই টি লাইব্রেরী থেকে দুটি এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে একটি। দুটি পাওয়া গেছে বিদেশ থেকে।

'গ্রন্থাগারের নীতিশাস্ত্র' প্রবন্ধে ডঃ আদিত্য কুমার গুহদেদার গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণ বিধির প্রয়োজনীয়তা ও তার মূল্যায়ন করেছেন। তিনি বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী একে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান কোর্সের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন।

'রবীন্দ্র চিন্তায় গ্রন্থাগার' শ্রী প্রবীর রায় চৌধুরীর এই প্রবন্ধটি বাংলা থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার ডঃ তপন-জ্যোতি ব্যানার্জী। এই প্রবন্ধটি পূর্বে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় (৩৬ বর্ষ; বৈশাখ ১৩৯৩; পৃঃ ব ১—৯ দ্রঃ) প্রকাশিত হয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, দ্বিভাষিক পত্রিকার জন্য বাংলা থেকে আবার কেন ইংরাজী করা হল? বাংলায় ছাপালেই তো হত। সম্ভবতঃ বাংলা ভাষাভাষী নন এরকম লোকেদের গোচরে প্রবন্ধটি আনার জন্যই এই প্রচেষ্টা। তবে তপনজ্যোতি বাবুর অনুবাদ যে অত্যন্ত সাবলীল হয়েছে তা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন।

'বাংলা ব্যক্তি নামের স্বরূপ সংলেখ' (Form of Entry of Bengali Personal Names) প্রবন্ধে শ্রী বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, সূচীকরণে ভারতীয় লেখকদের ব্যক্তি নামের স্বরূপ সংলেখ এতকাল যেভাবে হয়ে এসেছে তা ত্রুটিপূর্ণ। সাধারণত য়ুরোপীয় খ্রীষ্টান নামের অনুরূপভাবে এটা হত বংশনাম বা পদবী অনুযায়ী। কিন্তু ভারতীয় নাম বিশেষ করে বাংলা ব্যক্তি নামের ক্ষেত্রে আদ্য নামই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গীয় তথা ভারতীয় গ্রন্থাগারিকরা কিন্তু বহুকাল পূর্ব থেকেই এই ত্রুটি সম্পর্কে সোচ্চার হয়েছিলেন। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং ইয়াদলিকে এনিয়ে আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। এমন কি, ইউনেস্কো সেই ১৯৫২ সালেই সূচীকরণের ক্ষেত্রে ভারতীয় নামের স্বরূপ সংলেখের এই ত্রুটি লক্ষ্য করেছিলেন। ১৯৬১ সালে ইউনেস্কোর উদ্যোগে প্যারিসে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি প্রয়াত বিনয়েন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর প্রবন্ধে ভারতীয় ব্যক্তি নামের এই সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। যদিও ঐ সম্মেলনে ভারতীয় ব্যক্তিনামের সমস্যাগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল এবং ঐ সম্মেলনে AACR-এর পরিমার্জিত সংস্করণের সম্পাদক মিঃ সেমুর লুবেৎস্কি উপস্থিতও ছিলেন কিন্তু তাঁর সম্পাদিত AACR-এর ঐ সংস্করণে ঐ আলোচনা কোন প্রভাব বিস্তারই করতে পারেনি দেখা গেছে। অতএব ভারতীয় নামের ক্ষেত্রে এই সমস্যা থেকেই গেছে। দক্ষিণ ভারতীয়দের ব্যক্তিনামে পদবী প্রধান হয়ে উঠেনা কিন্তু

বাংলা নামের ক্ষেত্রে আধুনিককালে ইংরাজী আনার ফলে পদবীই প্রধান হয়ে উঠেছে।

সৌদি আরবের রিয়াধ থেকে তথ্য বিজ্ঞানী 'RILISAR Bulletin' সম্পাদক মিঃ আব্বাস ইব্রাহিম লিখেছেন 'ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে বিশ্বকোষ রচনার নিয়মাবলী সম্পর্কে এবং এইরূপ বিশ্বকোষ সংগঠনের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তা তিনি সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন এই প্রবন্ধে।

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ পি সোমা রাজু তাঁর 'জ্ঞানের জগৎ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সঙ্গে এর সম্পর্ক' প্রবন্ধে বলেছেন এ বিশ্বের এমন অনেক সত্তা রয়েছে যা আমাদের অজ্ঞাত। কিছু কিছু লোক এক একটি স্তরের বুদ্ধি বৃত্তি নিয়ে এই সত্তাগুলির কোন কোনটি সম্পর্কে একটা ধারণা মাত্র করতে পারে। কিন্তু জ্ঞানের জগৎ ক্রমাগতঃ বেড়েই চলে। কেননা মানুষই তার নিত্য প্রয়োজনে জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে চলেছে। এই প্রবন্ধে প্রথমে জ্ঞানের প্রকৃতি, তার ব্যবহার, সঞ্চালন ও সংরক্ষণ এবং গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও তার প্রয়োজনীয়তা এবং গ্রন্থ বর্গীকরণ নিয়ে প্রাথমিক কিছু আলোচনার পর বিষয়ের জগৎ সম্পর্কে অধ্যয়নের উদ্দেশ্য এবং এর সঙ্গে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

খড়্গপুরের আই আই টি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সর্বশ্রী রজনী আহুজা, বি, সাইবাবা ও এন কে ভট্টাচার্য এবং ঐ সংস্থারই কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শ্রী আর কে সেন তাঁদের "বহু গণনিক পঞ্জীকরণ প্রকরণ পর্যালোচনা" প্রবন্ধে প্রথমে হস্তসাধিত পঞ্জীকরণের বিভিন্ন পর্বের কথা বর্ণনা করে যন্ত্রগণকিত পঞ্জীকরণ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এই লেখকগণ একটি পাইলট প্রজেক্টে কম্পিউটারের সাহায্যে পঞ্জীর উপাত্ত কোষ গঠন এবং তথ্য পরিবেশন ব্যবস্থা, সরাসরি অথ্যোদ্ধার ব্যবস্থা, নির্ঘণ্ট সহ মুদ্রিত পঞ্জী, অন্তর্ভুক্ত পত্রিকার তালিকা প্রণয়ন ইত্যাদি নিয়ে যে কাজ করেছিলেন সে সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে পর্যালোচনা করেছেন।

ইংলণ্ডের লাফবরো প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের শ্রী সুবল চন্দ্র বিশ্বাস এবং কুয়েতে ফাণ্ড ফর আরব ইকনমিক ডেভলপমেন্ট, কুয়েত-এর মিঃ মহম্মদ আবদুর রশীদ তাঁদের প্রবন্ধে "তথ্য প্রযুক্তির নতুন প্রথা বি বি সি ডুমসডে সিস্টেম" ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন-এর 'ডুমসডে বুক' নামের প্রজেক্ট যা বিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ জনজীবনের স্থায়ী রেকর্ড রাখবে, সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। স্কুল কলেজের শিক্ষায়, গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের তথ্য প্রদানের কাজে কর্মে, পর্যটকদের ভ্রমণ সহায়ক সংস্থা ও বাণিজ্যসংস্থা তথা সরকারী দপ্তরের কাজে কর্মে এবং লেখক ও সাংবাদিকের কাজে নানাভাবে এই প্রথার ব্যাপক প্রয়োগের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে বলে তাঁরা এই প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন। খড়্গপুর আই আই টি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শ্রী এ কে বক্স তাঁর "বৈদেশিক পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ—আই আই টি খড়্গপুর গ্রন্থাগারের পর্যালোচনা" প্রবন্ধে বৈদেশিক পত্রিকার প্রকৃতি, প্রয়োজনীয়তা, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির দরুণ এগুলি সংগ্রহের জন্য অর্থ সংস্থান ও অন্যান্য সমস্যা আলোচনা করে এগুলির সম্ভাব্য সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিজ্ঞান বিভাগের শ্রী সত্যানন্দ মণ্ডল "বাংলা লিপির রূপান্তর" নামক তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, লিপির রূপান্তর যেমন ভাষাবিজ্ঞানীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গ্রন্থাগারও তথ্যবিজ্ঞানীর পক্ষেও। এক লিপি থেকে অন্য লিপিতে রূপান্তর করা হয় লিপ্যন্তরণ ও প্রতিলেখন এই দুটি মূলনীতি অনুসারে। বাংলা লিপির ক্ষেত্রে পঞ্জীকরণ ও সূচীকরণে এই পদ্ধতি কিভাবে প্রয়োগ করা হবে এবং বাংলা লিপির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কিভাবে এই রূপান্তর হবে তা বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যবহার দেখেও বিশেষভাবে করে লেখক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এ ব্যাপারে একটি নির্ধারিত বিধি বা মান থাকা প্রয়োজন।

শেষ দুটি প্রবন্ধ যথাক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের ডঃ ভুবনেশ্বর চক্রবর্তীর

"গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রসঙ্গ গবেষণা" ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শ্রীপ্রদীপ চৌধুরীর "পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার শিক্ষণ ব্যবস্থা" বাংলায় লেখা।

প্রথম প্রবন্ধটিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, বৃত্তিমূলক উচ্চশিক্ষা তথা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান গবেষণার মধ্য দিয়েই বিকাশলাভ করে। গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণার উদ্দেশ্য হল, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের কাজকর্ম কত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় তার উপায় উদ্ভাবন করা। তিনি গ্রন্থাগার গবেষণার গতি প্রকৃতি, কিছু প্রবণতা ও গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এই বলে যে বর্তমানে একক গবেষণার চেয়ে দলগত গবেষণার প্রবণতা দেখা দিলেও তা গ্রন্থাগার গবেষণার ক্ষেত্রে আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পায়নি।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের আদিযুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কোথায় কোথায় এই শিক্ষণ ব্যবস্থা চালু হয়েছিল এবং বর্তমানে কোথায় কোথায় এখনো চলছে তার একটা বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই লেখকের প্রায় একই রকম আর একটি প্রবন্ধ কিছুকাল পূর্বে সম্ভবতঃ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় পড়েছিলাম। এই প্রবন্ধের কোথাও তার উল্লেখ দেখা গেলনা। অন্ততঃ 'নির্দেশিকায়' যে বারোটি সূত্র নির্দেশ করা হয়েছে তাতে আর একটি যোগ করলে ক্ষতি ছিল না।

সমালোচ্য পত্রিকাটির প্রতিটি প্রবন্ধের বক্তব্য অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করলেও আলোচনাটি দীর্ঘ হয়ে গেল। তবে এটা এই উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে যে, নতুন পত্রিকাটির সার্থকতা কোথায় তা যাতে স্পষ্ট হয়। গ্রন্থাগার বৃত্তির লোকেদের একটি নতুন পত্রিকা উপহার দেওয়ার আমরা বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগকে অভিনন্দন জানাই। পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে বিভাগের সমস্ত শিক্ষকই আছেন এবং বর্তমান বছরের আটজন ছাত্রছাত্রী পরিচালক মণ্ডলীতে রয়েছেন এই সংখ্যাটি প্রকাশের জন্য। আমরা আশা করব যে, একটি দুটি সংখ্যা প্রকাশ করেই যেন এঁদের উদ্যম নিঃশেষ না হয়ে যায়।

পত্রিকার প্রচ্ছদ সুরুচির পরিচয় দেয়। ভালো কাগজ ও পরিচ্ছন্ন মুদ্রণের জন্য পত্রিকাটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। মুদ্রণ প্রমাদ বিশেষ একটা চোখে পড়ল না। তবে ইম্পোজিশনের ত্রুটির জন্য ২৭ নম্বরের পৃষ্ঠাটি উল্টোভাবে ছাপা হয়েছে। পত্রিকার এই সংখ্যায় জন্য বেশ ভালোরকমই বিজ্ঞাপন জোগাড় হয়েছে।

—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ

জেলায় জেলায় কনভেনশন :

গত জুলাই মাস থেকে শুরু করে বিভিন্ন জেলায় গ্রন্থাগার কর্মীদের যে কনভেনশন গুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'গ্রন্থাগার পাঠকদের অবগতির জন্যে প্রকাশ করা হলো।

পশ্চিম দিনাজপুর।

বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৯, পঃ দিনাজপুর জেলা কনভেনশনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন, বক্তব্য রাখেন—সভাপতি শ্রী ক্ষিতীশ চন্দ্র মণ্ডল, সম্পাদক শ্রী প্রদীপ কুমার নন্দী এবং বি. এস এর পক্ষে শ্রী বীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু প্রমুখ। কর্মী জীবনের নানান সমস্যা, এবং তার সমাধানের জন্যে উপযুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলা ইত্যাদি ছিল মূলতঃ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

মালদহ :

পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগারের কর্মী সমিতি মালদহ জেলা শাখার উদ্যোগে, জেলা গ্রন্থাগারে, বিগত ২৩শে আগষ্ট, ১৯৮৯ এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়, এবং শতাধিক গ্রন্থাগার কর্মী অংশগ্রহণ করেন, কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন অভয় ব্যানার্জী। গ্রন্থাগার আইন ও সরকারী নিয়মনীতি লঙ্ঘন প্রভৃতি ছিল আলোচনার মূল বিষয় বস্তু।

নদীয়া :

বিগত ২২শে আগষ্ট, ১৯৮৯ জেলা গ্রন্থাগার ঘূর্ণী কৃষ্ণনগরে পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা সভাপতি, শ্রী অলোক দত্তের সভাপতিত্বে এই জেলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় শতাধিক গ্রন্থাগার কর্মী ও প্রতিনিধি এই কনভেনশনে অংশ গ্রহণ করেন। কর্মীদের দাবী দাওয়া, অবসর প্রাপ্ত কর্মীদের আর্থিক সুযোগ, রাজ্য-গ্রন্থাগার মহকের নজির বিহীন কার্যকলাপ প্রভৃতি বিষয় কনভেনশনে উপস্থাপিত হয়।

হাওড়া :

পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি হাওড়া জেলা শাখার উদ্যোগে, গত ২৬শে জুলাই, ১৯৮৯ হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী অনিল কুমার দেবনাথ। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন জেলা সম্পাদক শ্রী অশোক কুমার দাস, কর্মী সমিতির রাজ্য কমিটির সভাপতি শ্রী বিশ্বনাথ কোলে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে শ্রী সুবিনয় ঘোষ, শ্রী পিনাকী মুখোপাধ্যায়, শ্রী সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, এবং আরও অনেকে। কনভেনশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রায় ১০০ জন গ্রন্থাগার কর্মী ও অনুরাগী। রাজ্য গ্রন্থাগার দপ্তরের বর্তমান ভূমিকা, মাসের প্রথম তারিখে বেতনের সুযোগ, অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশন প্রাচুইটি ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রন্থাগারগুলির শূন্যপদে নিয়োগ, হাওড়া জেলায় বই মেলার সংগঠন প্রভৃতি বিষয় কনভেনশনে গুরুত্ব পায় করে।

উত্তর ২৪ পরগনা :

গত ১৬ই আগষ্ট, ১৯৮৯ বারাসত সুভাষ ইনস্টিটিউট হলে, পঃ বঃ সাধারণের কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যৌথ আহ্বানে এই জেলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন শ্রী দেবব্রত পাল, শ্রী রনজিৎ মিত্র এবং আরও অনেকে। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরী ও কনভেনশন পরিচালনা করেন কর্মী সমিতির জেলা কমিটির সভাপতি শ্রী কল্যাণ ঘোষ। গ্রন্থাগার গুলিতে অনিয়মিত অনুদান গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের ব্যতিরেকে বই মেলার সংগঠন, এস এস সি ও এল এল এ তে কর্মী

প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করা, কর্মীদের নিয়মিত বেতনদানে অনীহা, গৃহ নির্মাণের জন্য বরাদ্দ টাকা গ্রন্থাগারগুলিকে বণ্টন না করা, ইত্যাদি বিষয় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়।

মেদিনীপুর :

মেদিনীপুর শহরে দুর্গাদেবী ঘোষা স্মৃতি ভবনে, গত ১৬ই আগষ্ট ১৯৮৯, এই জেলা কনভেনশন আহূত হয়। কনভেনশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে বিশিষ্ট জননেতা অধ্যাপক দীপক সরকার। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শ্রী অনিল চাকী, জেলা গ্রন্থসংসদ কর্মী সমিতির সম্পাদক শ্রী রাধারমণ প্রামাণিক, ও জেলার যুগ্ম সম্পাদক শ্রী শ্যামল দাস প্রমুখ। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন কর্মী সমিতির জেলা সভাপতি শ্রী সুনান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। সেনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির বিভিন্ন সমস্যাদি সমাধানের জন্য সরকারের কাছে কর্মী সমিতি নানান সময়ে যে স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন মূলতঃ তারই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল।

বাঁকুড়া :

পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগারের কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যৌথ উদ্যোগে, এবং শ্রী কৌশিক বিশ্বাসের সভাপতিত্বে গত ২৪শে জুলাই ১৯৮৯, বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগারে প্রায় ২০০ জন কর্মীর উপস্থিতিতে উক্ত জেলা কনভেনশন সাফল্যের সঙ্গে পরিসমাপ্ত হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী অরুণ রায়, ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষে কুমঃ সুধীর ব্যানার্জী, কো-অর্ডিনেশন কমিটির তরফে কুমঃ প্রভাত দত্ত, এবং পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার সমিতির পক্ষে শ্রী মৃদুল মিত্র প্রমুখ বক্তব্য রাখেন, গ্রন্থাগারে কর্মীদের মধ্যে ঐক্য, সংশ্লিষ্ট সমস্যা, গ্রন্থাগার আন্দোলনের বর্তমান অচলাবস্থা ও তার কারণ, সাধারণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সার্বজনীন শিক্ষার সম্ভাব্যতা প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনায় গুরুত্ব লাভ করে।

কোচবিহার :

গত ৯ই আগষ্ট, ১৯৮৯, সুকান্ত মঞ্চে কোচবিহার জেলা কনভেনশন প্রায় ১৬০ জন কর্মীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষ থেকে শ্রী অরুণ ভট্টাচার্য এই কনভেনশন উদ্বোধন করেন, বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক শ্রী রতন বক্সী, ও রাজ্য কমিটির পক্ষে শ্রী তরুণ রায়, শ্রী ব্রজগোপাল গোস্বামী প্রমুখ সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন দাবিতে ১১০০ টাকার একটি ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ প্রদত্ত হয়।

দার্জিলিং :

বিগত ২৬শে জুলাই, ১৯৮৯ তারিখে শিলিগুড়ি কাঞ্চন জঙ্ঘা স্টেডিয়ামে শ্রী বীরেন চক্রের সভাপতিত্বে জেলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রী অশোক ভট্টাচার্য্য, লেখক শিল্পিসঙ্ঘের শ্রী নৃপেন ঘোষ, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে শ্রী এস্ লাহিড়ী প্রমুখ। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বর্তমান পরিস্থিতি, জেলা গ্রন্থাগার গুলির সমস্যা, ভি এল ও'র নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়গুলি কনভেনশনে উপস্থাপিত হয়।

সংকলক প্রণবানন্দ জানা

গ্রন্থাগার সংবাদ

মুর্শিদাবাদ :

বহরমপুর গার্লস কলেজ লাইব্রেরী : গত ৭ই আগষ্ট ১৯৮৯, কলেজ লাইব্রেরীর উদ্যোগে একটি প্রদর্শনী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

হুগলী :

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সঙ্ঘ : গত ২০শে জুলাই ১৯৮৯, চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সঙ্ঘের নবনির্মিত গৃহ এবং তৎসহ যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মেমিনার হল" ও একটি স্থায়ী চিত্রসংগ্রহশালা 'মুক্তির সংগ্রামে ভারত' এবং এই সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে সংগ্রহের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে প্রথাত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ডাঃ মুরারীমোহন মুখোপাধ্যায় কৃতিত্ব ও অবদানের কথা সবিস্তারে আলোচিত হয়। 'মুক্তির সংগ্রামে ভারত' শীর্ষক স্থায়ী চিত্র সংগ্রহশালাটি উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী মাননীয় শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়। মঞ্চের পক্ষ থেকে জেলা বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংবর্ধিত করা হয়। সাধারণ সম্পাদক শ্রী গণেশ নন্দী সরকারী ও বেসরকারী সহায়তায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এই স্থায়ী চিত্রশালাটি নির্মাণের যৌক্তিকতা, বিশিষ্টতা প্রভৃতি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন।

উত্তর ২৪ পরগণা :

পবিত্র রায় স্মৃতি পাঠাগার (গড়ঃ শনসর্ড টাউন লাইব্রেরী, কালিকাপুর, বারাসত, উঃ ২৪ পরগণা) : গত ১লা অক্টোবর গ্রন্থাগার সপ্তাহের উদ্যোগে পাঠাগার গৃহে এক মনোরম আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মোট ৬৪ জন পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন, এবং ইহা স্থানীয় কিশোর কিশোরীদের মধ্যে বেশ সাড়া জাগায়। গ্রন্থাগার সভাপতি তাঁর বক্তব্যে এই ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন ও সকলের কাছে সহযোগিতার প্রার্থনা রাখেন।

হুগলী ডিষ্ট্রীক্ট পাবলিক লাইব্রেরী এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ : গত ২৫শে অক্টোবর, ১৯৮৯, উক্ত সোসাইটির ৪র্থ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এটি হুগলী জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের একটি কল্যাণকর সার্থক প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৪ সালের ২৪শে জুন তারিখে জন্ম নিয়ে প্রতিষ্ঠানকে ধীরে ধীরে কর্মীদের কাছে অপরিহার্য ও মঙ্গলের আধার রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের সামাজিক দায়িত্ব পালনে, গৃহ নির্মাণে, আকস্মিক বিপদে প্রিয়জনের চিকিৎসায় অর্থ সংস্থানে এই প্রতিষ্ঠান উত্তরোত্তর সহযোগিতায় সক্রিয় হয়ে উঠছে।

সংকলক : প্রণবানন্দ জানা

CALCUTTA

ENGLISH ABSTRACTS

of the articles etc. of 'GRANTHAGAR'

Prepared by P. Jana

Vol. 39 (August September, 1989), No. 5

Editorial : Development of human resources for the libraries. p 102—104,

Development of human resources or manpower planning for library and information system is drawing much attention now-a-days. IASLIC has rightly chosen the subject as the topic for their this year's annual conference. The factors actuating the said development in this state must be identified and assessed. Different training centres in librarianship were started and continued by different organizations and institutions like the Hooghly District Library Association, Bengal Library Association, Imperial Library, Calcutta University etc. to supply the required man power, mainly to libraries of the educational institutions, for a long time. Of course, right from the begioning, there was no clear-cut planning for this and training in librarianship sometimes was even not an essential criteria for one's appointment in a library. In fifties the trend remained same in the case of the goverooment sponsarod libraries as well. However, in 1957 the Pay Commission, appointed by the State Government, made Diploma in Librarianship a must, particularly for professional appointments in Higher Secondary schools. In the sixties and seventies, in spite of the provision for job opportunities for all the trained manpower significantly lacking, several other centres for imparting training in librarianship opened. The recommendation of Ranganathan Committee of 1958 and the U.G.C. Circular of 1962 were not strictly followed, for a long time. The policies of the Left Front Government regarding the betterment of library services in the state, brought about considerable progress in developing the related human resources. Estimated vacancies in various libraries and qualification requirements for different posts have been stated. Total output of categories of trained manpower, for library and information system in the state, has been mentioned. The vast job opportunities, that flourished in the beginning of the Left Front Government's rule, have come to a stand-still during the last four-five years. Introduction of automation and reservation for SC/ST candidates are the causes of a number of vacancies.

Absence of prior consideration for job potentiality for the trained human resources, unusual restriction to admission to some of the existing training courses, lack of proper assessment of infrastructural facilities to run a course, and introduction of correspondence courses by open universities, have been creating a grave concern. All these may be assigned to the defective planning and appointment policies of both the Central and State Governments, relating to library and information system and also for that of the Private Sectors, Colleges and Universities etc. The situation is becoming more and more critical. A solution is urgently needed. The Association thinks that an appropriate measure for this may be taken through the unification of all the Lib. Sc. training centres in the state.

Reminiscences : Pramil Chandra Basu. p.105—110.

The author describes in details the personality, activities and achievements of Sri Pramathanath Bandyopadhyay who became the Vice-Chancellor of Calcutta University, in 1946, after Dr. Radhabenode Pal. He also refers to Sri Satish Chandra Ghosh, in his different administrative capacities in the Calcutta University, in connection with Prof. Benerjee. The impact of the terrible communal riot in Calcutta, the partition, and the winning of independence, greatly affected the university in many ways. Prof. Banerjee, as the Vice-Chancellor of the Calcutta University with other educationists and culture-loving persons, successfully managed the situation. Bengali was given its due status as the medium for the higher education, for the first time. Unfortunately, Prof. Banerjee had to resign in 1949, on account of some unhappy circumstances, caused by students' agitation, corruptions in the examination results and administration, of the university. Sri Charu chandra Biswas became the Vice-Chancellor of the university after Sri Bandyopadhyay.

Some aspects of in-house training : Nandita Bhattacharyya. p. 111-113.

Professionals must have frequent trainings or refresher courses to sharpen their skill and knowledge according to the needs of the day and situations. Development of both trained and untrained workers in a library may be effectively attained through the arrangement of in-house training in their respective places of work. Purposeful library services can only be provided to the users efficiently by well-trained skilled workers. In-house trainings have some inherent advantages, in addition to the scope of aquaintance with new developments in the filed. The author explains in details about the utility of

such a trainings, reqirements for organizing such a training programme and the procedure of executing the same. The importance of In-house training to enhance the library facilities to the society at large, in the Indian context, is quite obvious.

The convention of College Librarians and and Library Workers. p.114-119

The Conventiou was held in the Dwarbhanga Hall of Calcutta University on 20th August, 1989. It was presided by Prof. Prabir Roychoudhury, President, Bengal Library Association and was atteneded by more than one hundred participants. The President remarked in his inaugural address that in spite of positive steps taken by the Left Front Goverament in the State of West Bengal, in respect of the public libraries, college libraries are still beset with some problems, relating to the status and pay scales of the college librarians, quality of the library services provided, staff pattern, and qualification needed, as recommended by the U.G.C. superish alike. General Secretary, AIFUCTO supported the president's speech fully. He also pointed-out that the status of the college librarians must be equal to that of the college teachers. Secretary, WBCUTA informed that their discussion with the state government included the affairs of the college librarians, and Calcutta University Syndicate has constituted a committee to determine the status of the same. The Secretary, West Bengal Government College Library Association, justified the holding of the convention and B L A's stand for the cause of college librarians. He suggested for a joint deputation of BLA, WBCUTA and WBGCTA and suported the appropriateness of the appointments of the college librarians through College Service Commission. The draft proposals of the convention were presented on behalf of BLA. A number of participants took part in the discussions followed. Seven proposals comprising (1) the pay scales of the college librarians and assistant librarians, (2) their status and service rules, (3) appointments criteria, (4) development of professional standard, (5) development of college library system, (6) requirements for other employees of the college libraries, (7) similar treatment for the librarians and assistant librarians of medical colleges and polytechnics, were accepted. The convention requested BLA to take an initiative to start a movement to realiring the charter of demands pleaced.

P8438

সংগ্রহ করুন

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
প্রকাশিত গ্রন্থরাজি

- প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা ১০৲
- কুরুক্ষেত্র : নীলা মজুমদার ১৫৲
- কুরুক্ষেত্র পরিক্রমা : পণ্ডিত সরকার সম্পাদিত ৫০৲
- কলকাতা : তিনশতক কৃষ্ণ ধর ১১৲
  বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিজিতকুমার দত্ত ১৲
- প্রেমচন্দ নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ ৭৲
- সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতা সংগ্রহ ১০৲
- আকাদেমি পত্রিকা ১ : অরুণশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০৲
- আকাদেমি পত্রিকা ২ : অরুণশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০৲

প্রাপ্তিস্থান

১। আকাদেমি দপ্তর, কলকাতা তথ্যকেন্দ্র
১১, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৩
কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল কাউন্টার
৭ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা-৭০০ ০৭৩
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
দে বুক স্টোর, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৬৯৪৭/৮৯

Annual Subscription : Rs. 36.00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal Regd. No WB/CC –145
Regd. No. R. N. 2674-47

Volume 39 No. 7 October-November 1989

প্রকাশিত হয়েছে

রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার

উৎস

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী

• রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত চিন্তার বিস্তারিত আলোচনা। • রবীন্দ্র প্রসঙ্গ গ্রন্থপঞ্জীতে এক হাজারের মত রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত বইয়ের টীকা সম্বলিত পঞ্জী বিভিন্ন ধরণের নির্ঘন্ট সম্বলিত

মূল্য কুড়ি টাকা

বিমলকান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার সঙ্কলিত

গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা

আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের শব্দাবলীর বাংলা পরিভাষা

প্রতিটি গ্রন্থাগারে রাখার উপযোগী

মূল্য পঁচিশ টাকা

পাওয়া যাচ্ছে

আশিতকুমার ওকদেদার এর

গ্রন্থবিদ্যা

॥ ৩য় সংস্করণ ১৯৮৪ ॥

শোভন সংস্করণ—পঁচিশ টাকা

সুলভ সংস্করণ—কুড়ি টাকা

গ্রন্থবর্গীকরণ

ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী

শোভন সংস্করণ—চল্লিশ টাকা

ছাত্র সংস্করণ—বত্রিশ টাকা

Printed & Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Calcutta—700 073, General Office : P-134 CIT Scheme 52 Calcutta-700 014 Phone : 29-8466 at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005
Editor: Ramkrishna Saha